শহীদ কাদরীর কবিতা ঃ বিষয় ও প্রকরণ।

গবেষক
রায়হানা রহমান
শিক্ষাবর্ষ ২০১৪-২০১৫
রেজিস্ট্রেশন নম্বর ২১
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
নভেম্বর ২০২২

Dhaka University Institutional Repository

এমফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম

শহীদ কাদরীর কবিতা ঃ বিষয় ও প্রকরণ।

তত্ত্বাবধায়ক
ড. ফাতেমা কাওসার
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
রায়হানা রহমান
শিক্ষাবর্ষ ২০১৪-২০১৫
রেজিস্ট্রেশন নম্বর ২১

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

শহীদ কাদরীর কবিতা ঃ বিষয় ও প্রকরণ।

এমফিল গবেষক
রায়হানা রহমান
শিক্ষাবর্ষ ২০১৪-২০১৫
রেজিস্ট্রেশন নম্বর ২১
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
নভেম্বর ২০২২

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধীনে 'শহীদ কাদরীর কবিতা ঃ বিষয় ও প্রকরণ' শিরোনামে, এমফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভ উপস্থাপন করলাম। আমার জানা মতে, উল্লেখিত শিরোনামে এ যাবৎ কোন প্রতিষ্ঠানিক গবেষণা সম্পন্ন হয়নি।

অভিসন্দর্ভটি আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. ফাতেমা কাওসারের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় প্রস্তুত করা হয়েছে। এ অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক গবেষণা। সম্পূর্ণ অভিসন্দর্ভ কিংবা এর অংশবিশেষ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রি লাভ কিংবা কোনো প্রকার প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। সহায়ক যেসব তথ্য, উপাত্ত ও মন্তব্য অন্য উৎস থেকে গৃহীত হয়েছে সেগুলোর সূত্র যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশিষ্ট বিশ্লেষণ আমার নিজস্ব।

রায়হানা রহমান

এমফিল গবেষক

শিক্ষাবর্ষ ২০১৪-২০১৫

রেজিস্ট্রেশন নম্বর ২১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, রায়হানা রহমান কর্তৃক উপস্থাপিত 'শহীদ কাদরীর কবিতা ঃ বিষয় ও প্রকরণ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। তার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ২১, শিক্ষাবর্ষ ২০১৪-২০১৫, গবেষণায় যোগদানের তারিখ ২১.৫.২০১৫।

এই অভিসন্দর্ভটি তার একক ও মৌলিক গবেষণা, যা অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত হয়নি এবং এ অভিসন্দর্ভ বা এর অংশবিশেষ অন্য কোথাও প্রকাশিত হয়নি। গবেষককে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হলো।

ড. ফাতেমা কাওসার
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

'শহীদ কাদরীর কবিতা ঃ বিষয় ও প্রকরণ' আমার এমফিল অভিসন্দর্ভের মুদ্রিত রূপ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ড. ফাতেমা কাওসারের তত্ত্বাবধানে আমি এ অভিসন্দর্ভ রচনা করি। অভিসন্দর্ভ রচনায় তাঁর প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও তাগিদ আমাকে সাহায্য করেছে।

পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে ও ষাটের দশকে যেসকল সাহিত্যিক তাঁদের সৃষ্টিশীল কর্মে অনন্য হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে নাগরিক জীবনের বহুমাত্রিক বৈচিত্র্যময় জীবনঘনিষ্ঠ প্রকাশ যার রচনায় স্বকীয়রূপে প্রকাশিত ; তিনি হলেন বোহেমিয়ান কবি শহীদ কাদরী। বিহঙ্গসম জীবনাচরণে অভ্যস্ত কবি 'শহীদ কাদরীর কবিতা ঃ বিষয় ও প্রকরণ' পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে তাঁর বেড়ে ওঠার সময় ও দেশপ্রেক্ষিত অনুসন্ধানের দাবি রাখে। কেননা যে কোনো কাব্যালোচনাতেই সময়ের ব্যাপকতায় কবির চেতনা ও মনোসাংগঠনিক প্রক্রিয়া গড়ে ওঠে। স্থান-কাল ও উত্থানের প্রেক্ষিতে কবি তাঁর আপন জীবনাভিজ্ঞতা ও ইতিবাচক কল্পনার প্রসারতাকে ভাষারূপ দেন। যা কবিকে তাঁর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উন্নীত করে। সেক্ষেত্রে তিরিশোত্তর কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আধুনিকতা যেমন ভিন্নতর, একইভাবে কালের প্রবাহে একই সময়ের কবিদের মধ্যে প্রকাশিত বিষয় ও রূপদান কৌশলেও দেখা যায় ভিন্নতা। তাই ষাটের দশকের কবি শহীদ কাদরী একই সময়ে বেড়ে ওঠা কবিদের থেকে অনন্যমাত্রা পেয়েছেন তাঁর বিষয় বৈচিত্র্য ও প্রকরণ বিন্যাসের কারণে। অথচ আমার জানা মতে, ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের কবি শহীদ কাদরীর এ বিষয় নিয়ে উচ্চতর পর্যায়ে কোনো উল্লেখযোগ্য কাজ হয়নি। তাই আমি এ বিষয়ে একটা পরিকল্পিত গবেষণাকর্ম পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি এবং আমি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়কের পরামর্শে 'শহীদ কাদরীর কবিতা ঃ বিষয় ও প্রকরণ' শীর্ষক এমফিল গবেষণা সমাপ্ত করে - তা উপস্থাপন করেছি।

এ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. বায়তুল্লাহ্ কাদেরী, অধ্যাপক ড. গিয়াস শামীম, ড. নূরুন্নাহার ফয়জের নেছা (সহযোগী অধ্যাপক), বন্ধু ড. সোহানা মাহবুব, ড. তাশরিক ই-হাবিব, বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান পরামর্শ ও তথ্যাদি দিয়ে আমার গবেষণার কাজ সহজতর করেছেন। তাঁদের ঋণ স্বীকার করছি। এছাড়া গবেষণা কর্মে বই পত্র, তথ্যাদি ও সুপরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছে বন্ধু ড. ফজলুর রহমান (আদমজী ক্যান্ট. পাবলিক কলেজ), মোঃ আজাদুল ইসলাম (বোরহান উদ্দীন ডিগ্রি কলেজ) এবং বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে সহযোগিতা করেছে, আমার সহকর্মী মো. খালিদ হাসান (গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ)। তাঁদের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আমার কর্মস্থল গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ এই গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করে আমাকে কৃতজ্ঞতার-পাশে আবদ্ধ করেছেন। সেইসাথে আমার পরিবারের সদস্যবৃন্দ গবেষণাকর্ম চলাকালে আমাকে উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে চিরকৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছে, যাদের ঋণ অপরিশোধযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

অভিসন্দর্ভটি আমার একক প্রচেষ্টার ফসল নয়, বরং সকলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা ও আন্তরিকতার ফসল। যদি অভিসন্দর্ভটি সম্মানিত গবেষক ও পাঠকদের চিন্তার এতটুকু সহায়ক হয়, তবেই এ প্রচেষ্টা ও শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

রায়হানা রহমান

এমফিল গবেষক

শিক্ষাবর্ষ ২০১৪-২০১৫

রেজিস্ট্রেশন নম্বর ২১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ।

নভেম্বর ২০২২

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ

'সাহিত্য' হলো মানুষের জীবনেরই প্রতিচ্ছবি, যা আবহমান কাল ধরে প্রকাশের মধ্য দিয়ে সৃষ্টিশীল মানুষের জীবনসত্য উপলব্ধির নান্দনিক ধারক হয়ে উঠেছে। আর এ সাহিত্যের প্রচীনতম রূপ হলো কবিতা, যা মানব হৃদয়ের এক পরম আবেগিক বহিঃপ্রকাশ। অর্থাৎ কথা আর ছন্দের অনির্বচনীয় বাণী বিন্যাসই হলো কবিতা। আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে স্বতন্ত্র ভাবনার একটি উজ্জল নক্ষত্রের নাম শহীদ কাদরী (১৯৪২-২০১৬)। ষাটের দশকের কবি শহীদ কাদরী, শামসুল ইসলাম, রফিক আজাদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, আবুল হাসান, মোহাম্মদ রফিক, হুমায়ুন আজাদ, হুমায়ুন কবির, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা, মুহাম্মদ নুরুল হুদা প্রমুখ একই সময়ে বেড়ে ওঠা মানুষ হলেও তাঁদের প্রকাশরূপ প্রত্যেকের স্বতন্ত্র।

কালজয়ী কবি শহীদ কাদরী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তেতাল্লিশের মন্বন্তর, ছয়চল্লিশের দাঙ্গা, সাতচল্লিশের দেশভাগ, পাকিস্তানি স্বৈরশাসন,'৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধ পরবর্তী পরিবেশে বেড়ে ওঠা কবিমানস। আজন্ম গৃহচ্যুত হওয়া, অনিকেত ভাবনার কবি শহীদ কাদরী সমকালীন বাস্তবতার নিরিখে জীবনকে মুক্তির প্রত্যাশায় প্রত্যক্ষ করে; বিষয় বৈচিত্র্য ও প্রকরণ ভিন্নতায় হয়ে উঠেছেন স্বাতন্ত্র্য। আর এই ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানই এ অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য।

আমি আমার অভিসন্দর্ভটিকে গবেষণার প্রয়োজনে তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে আলোচনা করেছি। আমার আলোচনার প্রথম অধ্যায়ে আছে-শহীদ কাদরীর বেড়ে ওঠা দেশ কালের প্রেক্ষাপট ও কবিমানস। এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে রয়েছে -দেশকাল, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে কবির গড়ে ওঠা কবিমানস। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশ্লেষিত হয়েছে-কবিতার বিষয়। এ অধ্যায়ের চারটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে - শহরচেতনা। এ পরিচ্ছেদে কবি নগরজীবনের উপকরণ ব্যবহার করে, নগরের শূন্যতা ও ক্ষতকে বাস্তবতার আলোকে উপস্থাপন করেছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আছে- জীবনরূপায়ণ। এখানে কবি জীবনের নানামাত্রিক প্রান্তকে উপস্থাপন করেছেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে রয়েছে- দার্শনিকতা। এখানে কবি জীবনানুভূতি প্রকাশের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কথা প্রকাশ করেছেন। চতুর্থ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে- সমাজ ও রাজনীতি। এ পরিচ্ছেদে কবি সমকালীন সমাজ ও রাজনীতির প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে রয়েছে–শব্দ ও ভাষা বিষয়ক আলোচনা। এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অলংকার-চিত্রকল্প-প্রতীক-পুরাণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ছন্দ নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। আলোচনা শেষে আছে উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি।

আড্ডা অন্তপ্রাণ শহীদ কাদরী পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ-*'উত্তরাধিকার'*, *'তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা'*, *'কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই'*, *'আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও'* এবং *'গোধূলির গান'* রচনার মধ্য দিয়ে কালের স্বাক্ষর হয়ে আছেন বাংলা কাব্যসাহিত্যে। তিনি প্রাত্যহিকতার শব্দকে দেশকালের প্রেক্ষাপটে ধারালো করে তুলেছেন। কবি যুদ্ধ-

Dhaka University Institutional Repository

বিধ্বস্ত পরিস্থিতির অস্থিতিশীল জীবনকে সংবেদনশীলতার শব্দ চয়নে উপস্থাপন করেছেন, যা কবিকে স্বতন্ত্র বিষয় নির্বাচন ও প্রাকরণিক ভিন্নতায় বাংলা কাব্যজগতে দিয়েছে অনন্য উচ্চতা।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ভূমিকা **১-৩**

প্রথম অধ্যায় : দেশকাল ও কবিমানস **৪-১৪**

প্রথম পরিচ্ছেদ : দেশকাল
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : কবিমানস

দ্বিতীয় অধ্যায় : কাব্য বিষয় **১৫-৬০**

প্রথম পরিচ্ছেদ : শহরচেতনা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : জীবন রূপায়ণ
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : দার্শনিকতা
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সমাজ ও রাজনীতি

তৃতীয় অধ্যায় : প্রকরণ **৬১-৮১**

প্রথম পরিচ্ছেদ : শব্দ ও ভাষা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : অলংকার-চিত্রকল্প-প্রতীক-পুরাণ
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ছন্দ

উপসংহার **৮২–৮৩**

গ্রন্থপঞ্জি **৮৪–৮৮**

ভূমিকা

সাতচল্লিশ পরবর্তী বাংলা কাব্যধারায় গতানুগতিকতার বাইরে বিষয় ও ভাবের গভীরতায় স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনায় যে উজ্জ্বল নক্ষত্র আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি হলেন বোহেমিয়ান কবি শহীদ কাদরী। কিংবদন্তি সৃষ্টিক্ষম প্রজ্ঞার প্রতীক শহীদ কাদরী (১৯৪২-২০১৬) ষাটের দশকের নাগরিক জীবনের অস্তিত্বের বিপন্নতা, অভিযোজন অক্ষমতা এবং সমকালীন বাস্তবতার প্রকরণগত স্বতন্ত্ররূপ প্রকাশের নিপুণ শিল্পভাষ্যকার। সুগভীর মননের অধিকারী শহীদ কাদরীর মূল প্রবণতা ছিল বৈশ্বিক বোধকে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনার আশ্রয়ে কবিতায় প্রকাশযোগ্য করে তোলা। শহীদ কাদরীর সমকালে বিভিন্ন সাহিত্যিক – শামসুল ইসলাম (১৯৪২-২০০৭), আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩), আসাদ চৌধুরী (১৯৪৩), মোহাম্মদ রফিক (১৯৪৩), মহাদেব সাহা (১৯৪৪), আবুল হাসান (১৯৪৭-৭৫), হুমায়ুন আজাদ (১৯৪৭-২০০৭), হুমায়ুন কবির (১৯৪৮-৭২), নির্মলেন্দু গুণ (১৯৪৮), মুহাম্মদ নূরুল হুদা (১৯৪৯) প্রমুখের রচনায় যখন উঠে আসে সমকালীন রাজনৈতিক চেতনা ও সমাজ সংশ্লেষী মনোভাবের সঙ্গে অবক্ষয়িত জীবনভঙ্গির মিশ্রণে এক ধরনের বিপর্যয়, তখন শহীদ কাদরী জীবন-জগৎ দর্শনে আক্ষরিক অর্থেই বাস্তবতার দৃষ্টিভঙ্গিকে বোদলেয়ারীয় ক্লেদজ বৈকল্য ও তিরিশোত্তর অবক্ষয়ের বিষয়কে তুলে এনেছেন তাঁর কবিতায় প্রকরণগত স্বাতন্ত্র্যে। তিনি তাঁর কবিতায় বিস্তর জীবন অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির ভিত্তিতে তাঁর চারদিকের অসংলগ্নতা, প্রেম ও মানবিকতা, প্রেমহীন হৃদয়ের বিশুষ্কতা, ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ, রাজনৈতিক অসংলগ্নতাকে উপজীব্য করেছেন। সেই সাথে তিনি শনাক্ত করেছেন চিরাচরিত রাষ্ট্রের চরিত্র, রাষ্ট্রের গূঢ়ার্থ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মতো সুদূরন্বেষার অন্বয়গুলো। তিনি সত্য উচ্চারণ করে কবিতাকে জনমানুষের আকাঙ্ক্ষার কাছে পৌঁছে দেন। শহীদ কাদরীর কবিতা মূলত দুই ধরনের- একটি নৈর্ব্যক্তিক, নির্লিপ্ততার ব্যক্তিগত নৈকট্য ও দূরাগত বোধের স্পষ্ট বা অস্পষ্টতার। যেগুলোর সঙ্গে একজন তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন মানুষের ইচ্ছা ও চিন্তার বহুলাংশে মিল গড়ে উঠে। যা স্বাভাবিক শাশ্বত, সাবলীল ও সামগ্রিক। তাঁর অন্য রকম কবিতা- যা তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত বহুল প্রচলিত প্রেম-ভালোবাসার কবিতা।

পঞ্চাশের দশকের শেষার্ধে বেড়ে উঠা কবি শহীদ কাদরী মোট পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ নিয়ে মহাকালের সীমায় সক্রিয় পথিক হয়ে উঠেন। তিনি জীবদ্দশায় রচনা করেন চারটি কাব্যগ্রন্থ, এগুলো হলো–প্রথম কাব্যগ্রন্থ *'উত্তরাধিকার'* (১৯৬৭), দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ- *'তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা'* (১৯৭৪), তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ *'কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই'* (১৯৭৮) এবং দীর্ঘ তিরিশ বছর পর চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ *'আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও'* (২০০৯)'। এরপর মৃত্যুপরবর্তী সময়ে তাঁর পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ *'গোধূলির গান'*(২০১৭) প্রকাশিত হয়। আমার অভিসন্দর্ভের শিরোনাম- 'শহীদ কাদরীর কবিতা ঃ বিষয় ও প্রকরণ।'

সাতচল্লিশোত্তর বাংলাদেশের কবিতায় বহির্বাস্তবের প্রতিক্রিয়ায় কাব্য প্রসঙ্গ গঠিত হলেও বাইরের সংঘাতকে মনোরূপে ধারণের ফলে তাতে বিশ্লেষণ মননের চেয়ে আবেগ শক্তিই ছিল প্রবল। আবাল্য নাগরিক কবি শহীদ কাদরী সাহিত্যাঙ্গনে জীবনাভিজ্ঞতাকে প্রথাবিরোধী চেতনায়- একাকিত্ববোধ, নৈরাশ্যবাদ, বিচ্ছিন্নতা, প্রেম ও সৌন্দর্যের আকুতি তুলে এনেছেন নিরন্তর নাগরিক অস্তিত্বের নির্মোক বাঁশিতে। তাঁর সৃষ্টি কর্মে প্রতিফলিত হয়েছে আধুনিক মনন, বিশ্বজনীনতা ও স্বাদেশিকতার মিশেলে এক বিশিষ্ট শিল্পবোধ ও কাব্যভঙ্গি। নগরকে নিরাসক্ত বাস্তবতার প্রাত্যহিকতায় এবং নির্মেদ নিরাবেগ বর্ণনায় প্রকরণগত বৈচিত্র্যে তাঁর রচনা হয়ে উঠেছে ঋদ্ধ।

শহীদ কাদরীর কাব্য প্রকাশে নাগরিক বিবমিষা, ক্লেদ, বৈকল্য এবং আত্মজৈবনিক স্বীকারোক্তি যেভাবে রূপায়িত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে শিল্পসমৃদ্ধ ও কৌতূহল উদ্দীপক। তাঁর সৃষ্টি বাংলা কাব্য জগতে কাব্যবোধ ও ভাষা নির্মাণে দিয়েছেন নতুন মাত্রা। যা পরবর্তীকালের কবি ও কাব্য গবেষকদের বিচিত্রভাবে প্রভাবিত ও প্রাণিত করেছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কবিতা পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এ বিষয়ে গবেষণা কর্ম সম্পন্ন হলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে শিক্ষার্থীরা নিঃসন্দেহে উপকৃত হবে।

কালজয়ী কবি শহীদ কাদরী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে বাস্তবতার নিরিখে জীবনযুদ্ধে বেড়ে ওঠা ব্যক্তিমানস। শহীদ কাদরী তিনটি দেশ-কালের সীমারেখায় জীবনকে দেখেছেন ও উপলব্ধি করেছেন। তিনি সমকালীন অন্যান্য কবিদের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছেন তাঁর বিষয় ভাবনার নতুনত্ব ও সৃষ্টিশীল ভিন্ন প্রকাশভঙ্গির কারণে। তিনি পরিব্রাজক রূপে জীবনের নানামাত্রিক প্রকাশকে অনুপুঙ্খ দৃষ্টিতে অবলোকন করেছেন। বিশেষত কবি ঢাকার গ্রামীণ আবহের নাগরিক জীবনকে গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাঁর কবিতায় তুলে এনেছেন নগরমানুষের শূন্যতা, ক্লেদ ও হতাশার চিত্র। সেই সাথে প্রকাশ করেছেন জীবন জয়ের আরাধ্যস্থল স্বদেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা। স্বদেশপ্রেমের অনবদ্ধরূপ কবি প্রকাশ করেন – 'কবিতা অক্ষম অস্ত্র আমার, নিষিদ্ধ জার্নাল থেকে, পাখিরা সিগন্যাল দেয়, ব্ল্যাকআউটের পূর্ণিমায়, স্বাধীনতার শহর' প্রভৃতি কবিতায়। যেখানে '৭১ এর বাংলাদেশের রেখাচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সেই সাথে 'একুশের স্বীকারোক্তি' কবিতায় কবি দেশপ্রেমের ভিন্ন মাত্রা প্রকাশ করেন। যার কারণে কবি কৃষ্ণচূড়া ফুলকে তথা প্রকৃতিকে লাল পাগড়ি পরা পুলিশের রূপকে প্রকাশ করেন। কেননা প্রকৃতির অন্তঃসলীলা ধারা কবিসত্তার গভীরে নিরন্তর প্রবাহমান।

সর্বোপরি দেশ-মা-মাটি-বিদেশ আবর্তনে গড়ে ওঠে শহীদ কাদরীর চেতন জগৎ। এ কারণে কবি তাঁর কবিতায় সমাজ ও রাজনীতি, জগৎ ও জীবনকে নিবিড়ভাবে এঁকেছেন সার্বজনীন করে। শহীদ কাদরী প্রচলিত ধারনার শব্দকে ভেঙ্গে নতুন বুননে উপস্থাপন করেছেন 'বৃষ্টি বৃষ্টি' কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের বর্ষা কিংবা বৈষ্ণব পদাবলীর

বর্ষা যেমন মানব মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন, শহীদ কাদরীর বৃষ্টি সে ক্ষেত্রে বুর্জোয়া নিধনের ধারালো হাতিয়ার হয়ে উঠেছে, যা কবিকে করেছে স্বতন্ত্র।

অভিসন্দর্ভে শহীদ কাদরীর কাব্য ভাবনায় যে বহুমাত্রিক বিষয় ও প্রকরণগত প্রসঙ্গ এসেছে তা অনুসন্ধান করা হয়েছে। কবি মানসের অন্তর্ব্যক্তিক অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সাথে সমকালীন বাস্তবতার প্রেক্ষিত, সমকালীন জীবনচিত্র, মানুষের বিশ্বাসগত দর্শন এবং তাঁর প্রকাশগত প্রকরণ অনুসন্ধান করাই এ গবেষণার উদ্দেশ্য। গবেষণা এক প্রকার জ্ঞান অন্বেষণ। যা বিশেষ যুক্তিপূর্ণ নীতিমালার দ্বারা পরিচালিত। গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা গবেষণা কাজের পূর্বশর্ত। উপযুক্ত তথ্য ছাড়া কোনো গবেষণাই সম্ভব নয়।

বর্তমান গবেষণাকর্ম বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়েছে। তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য শহীদ কাদরীর কবিতার টেকস্ট অনুসরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে শহীদ কাদরীর কাব্য সম্পর্কিত যে সব গবেষণাকর্ম রচিত ও মুদ্রিত হয়েছে সেগুলোও গবেষণার সহায়ক উপাদান হিসেবে গৃহীত হয়েছে। সর্বক্ষেত্রেই অনুসৃত হয়েছে অনুসন্ধানী মূল্যায়ন।

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদঃ দেশকাল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধান্তিক বাংলার অন্যতম প্রধান কণ্ঠস্বর শহীদ কাদরী সমাজ ও সময়ের অভিজ্ঞতার দিক থেকে কবি হিসেবে বাংলা কাব্যধারায় আবির্ভূত হন শামসুর রাহমানের প্রায় এক দশক পরে পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে। কিংবদন্তি সৃষ্টিক্ষম প্রজ্ঞার প্রতীক শহীদ কাদরী ১৯৪২ সালের ১৪ আগস্ট ভারতের কলকাতার দিলকুশা, পার্ক সার্কাস এলাকায় এক অভিজাত বাড়িতে কলকাতার ব্ল্যাক আউটের সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক বন্ধনে অত্যন্ত ডানপিটে ও বাউন্ডুলে হিসাবে দুর্নাম কুড়িয়ে বেড়ে উঠেন আড্ডাঅন্তপ্রাণ শহীদ কাদরী। রাজনৈতিক বিবেচনায় শহীদ কাদরীর আবর্তিত সময় -ভারত পাকিস্তান আর বাংলাদেশ দেশকালে পরিবেষ্টিত। তাঁর ব্রিটিশ ভারতীয় কাল ১৯৪২ থেকে ১৯৪৭ সাল। ভারত ভাগ হলেও কাদরী পরিবার তখনও পূর্ব পাকিস্তানে আসেনি। পঞ্চাশের হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার ফলে বহু মুসলমান ভারত ছাড়তে বাধ্য হয়। তবে কাদরী পিতার মৃত্যুর পর সপরিবারে পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিলেন ১৯৫২ সালে। শহীদ কাদরী যখন কলকাতার পার্ক সার্কাসে জন্মগ্রহণ করেন তখন ছিল উত্তপ্ত পৃথিবী , তেতাল্লিশের মন্বন্তর, অর্থনৈতিক মন্দা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগসহ সমকালীন বাস্তবতা। যেসময় পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে চলমান ছিল একদিকে ধনতন্ত্রের আগমন অন্যদিকে পুরানো জমিদারী প্রথার অবক্ষয়। আসলে উক্ত সময়েই বাঙালির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার রূপ লাভ করে ও পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক সামাজিক এবং ভৌগোলিক ইতিহাসের সূচনা ঘটে। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন এবং তৎপরবর্তী বাস্তবতায় বাঙালি তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়নের শক্তি ও সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

মূলত ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতেই বাঙালি প্রথম উপলব্ধি করল বৈষম্যমূলক পাকিস্তানি শাসনব্যবস্থা এবং অস্তিত্বের প্রবল সংকট। যা ষাটের দশকের লেখক, বুদ্ধিজীবী ও কবিকুলকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। কবিরা তাদের অস্তিত্বের শেকড় খুঁজতে গিয়ে স্বাধিকারবোধে আন্দোলিত হন। তাঁদের কবিতার উজ্জীবনী শক্তি আসে সঙ্ঘচেতনা এবং নতুন মূল্যবোধের ভাষাচেতন থেকে। অর্থাৎ সে সময়ের কবিদের মানসপট গঠিত হয়েছে দ্বন্দ্বসংঘাতময় জটিল বিন্যাস প্রক্রিয়ার আবর্তনে। সে সময় তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রথিতযশা কবি হলেন শহীদ কাদরী। জন্মসূত্রেই কবি পেয়েছেন হৃদয় চেতনা হননকারী পীড়দায়ক পরিবেশ, সর্বত্রই ব্ল্যাকআউটের শহরে শৃঙ্খলিত পতাকার নিচে শুঁকেছেন বারুদের কটুগন্ধ। যার আত্মোপলব্ধি কবি 'উত্তরাধিকার' কবিতায় প্রকাশ করেন এভাবে –

কাঁটা-তারে ঘেরা পার্ক, তাঁবু কুচকাওয়াচ সারিবদ্ধ

সৈনিকের। হিরন্ময় রৌদ্রে শুধু জ্বলজ্বলে গম্ভীর কামান
ভোরবেলা সচকিত পদশব্দে ঝোড়ো বিউগলে
গাছ-পালা, ঘরবাড়ি হঠাৎ বদলে গেছে রাঙা রণাঙ্গনে।
(শহীদ কাদরী, প্রগুক্ত, উত্তোরাধিকার ,পৃ: ২২)

অথবা, এয়ারগানের/ ট্রিগার টিপে ছড়িয়ে দিয়েছি ছররা
কাকগুলোর শরীরে। কা-কা করতে করতে
সেইসব কাক লুটিয়ে পড়েছে কলকাতার ফুটপাতে...
এইসব হত্যার স্মৃতি হঠাৎ হানা দিল/সেদিন দুপুরবেলায়, আমার ছায়াচ্ছন্ন কৈশোরে ।
(শহীদ কাদরী, গোধূলির গান-হত্যার স্মৃতি, পৃ:৪৩)

যুদ্ধ-বিগ্রহময় পরিবেশের সাথে কবির বাল্যকাল মানেই রাজপথ, প্লাকার্ড, সিপাই এভেনিউ। দুর্ধর্ষ যৌবন মানেই -বুলেট, বেয়নেট, মিছিল, মার্চ পাষ্ট, মাতাল, জুয়াড়ি, বেশ্যা আর অন্যত্র রাষ্ট্র মানেই - কারফিউ, ১৪৪ ধারা, স্ট্রাইক, মহিলা বন্ধুর সঙ্গে এনগেজমেন্ট বাতিল যা তাঁর কবিতায় বিধৃত হয়েছে এভাবে-

রাষ্ট্র বললেই মনে পড়ে স্বাধীনতা দিবসের /সাজোয়া বাহিনী,
রাষ্ট্র বললেই মনে পড়ে রেসকোর্সের কাঁটাতার,/কারফিউ, ১৪৪ ধারা...
রাষ্ট্র মানেই রাষ্ট্রসংঘের ব্যর্থতা/রাষ্ট্র সংঘের ব্যর্থতা মানেই
লেফ্‌ট্ রাইট, লেফ্‌ট্ রাইট, লেফ্‌ট্ ।.
(শ.ক, তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা, রাষ্ট্র মানেই লেফ্‌ট্ রাইট লেফ্‌ট্, পৃ: ৬৫)

শহীদ কাদরী তাঁর 'স্কিৎসোফ্রেনিয়া' কবিতায় -রাষ্ট্রযন্ত্র, বিরুদ্ধমত ও পথের মানুষকে প্রতিনিয়ত ব্যক্তিত্ব ও মানসিক রোগাক্রান্ত যুদ্ধবাজ সমর নায়কদের পৃথিবী বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে দেশকালের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি অসহায়। যুদ্ধের ডামাডোলে সাধারণ মানুষ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে, বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টায় যুদ্ধবাজ সমর নায়কদের সামনে তারা প্রতিবাদে আত্মঘাতী হয়ে ওঠে। যার প্রকাশিত কাব্যরূপ–

চারদিকে বিস্ফোরণ করছে টেবিল,/ গর্জে উঠছে টাইপ রাইটার
চঞ্চল, মসৃণ হাতে বিশ্বস্ত সেক্রেটারীরা
ডিক্টেশন নিতে গিয়ে ভুলে গেছে শব্দ- চিহ্ন,/জরুরী চিঠির মাঝামাঝি...
গুনাগার হৃদয়ের মধ্যে ছদ্মবেশী গেরিলারা/ খনন করছে গর্ত, ফাঁদ, দীর্ঘ কাঁটা বেড়া।
সংবাদ পত্রের শেষ পৃষ্ঠা থেকে বেরিয়ে এসেছে /এক দীর্ঘ সাজোঁয়া বাহিনী
এবং হেডলাইনগুলো অনবরত বাজিয়ে চলেছে সাইরেন।
(শ.ক, প্রগুক্ত, স্কিৎসোফ্রেনিয়া, পৃ: ৭৩)

অনুসন্ধানী কবি শহীদ কাদরী সমকালীন বাস্তবতাকে দেখেছেন অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে। বয়স ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবির বাল্য পরিচয় দৃঢ়তর হয়েছে। শয়তানের উপস্থিতি তিনি লক্ষ্য করেছেন সর্বত্র প্রেমিকার অনুনয়ের পশ্চাতে, অনুজের ভক্তিতে, সমাজ নেতার মহৎ উক্তিতে। এমনকি সাধু-সন্তদের জীবনাচরণে বুর্জোয়া মানবতাবাদের কবিতা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতাতে তা দৃশ্যমান। যা সমকালীন দেশকালেই প্রতিবিম্বিত রূপ-

সুন্দর সূর্যাস্ত থেকে ভোর বেলাকার সূর্যোদয় / পর্যন্ত হেঁটেছি। আর অসীম অধৈর্যভরে ঘেঁটে,
সেই চঞ্চল, পিচ্ছিল জরায়নে সভয়ে দেখেছি / শয়তানের ধমল মুখ;
(শ.ক, প্রগুক্ত, নিরুদ্দেশ যাত্রা, পৃ:৩০)

এভাবে সমাজের সর্বত্র চোরাবালির উপস্থিতির অনুভব তাঁকে অবিশ্বাসী করে দিয়েছে। নিরাবলম্ব কবি হয়েছেন নিরাশ্রয় ও নিঃসঙ্গ, যা তাঁকে আত্মজ্ঞিাসায় উপনীত করেছে 'নপুংসক সন্তের উক্তি' কবিতায় -

কেন এই স্বদেশ -সংলগ্ন আমি, নিঃসঙ্গ উদ্বাস্তু,
জনতার আলিঙ্গনে অপ্রতিভ, অপ্রস্তুত, অনাত্মীয় একা,...
আমার দুচোখে শুধু পুঞ্জ পুঞ্জ কালিমার মতো লেগে আছে?
জানি, বিবর্ণ গোষ্ঠীর গোধূলির শেষ বংশজাত আমি।
(শ.ক, প্রগুক্ত, নপুংসক সন্তের উক্তি, পৃ:১৪)

আবার কবি নিজেকে সত্যসন্ধ দুরন্ত সন্তানও ভেবেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্ব বিবেক ও বিবমিষা থেকে উত্থিত যে সময়, তার ফলশ্রুতি এদেশে তিরিশের কবিতার উৎপত্তি। আর এ অগ্রযাত্রাকে অবলম্বন করে শহীদ কাদরী 'উত্তরাধিকার' কবিতায় বিশ্বব্যাপী বুর্জোয়া গণতন্ত্রের উত্থান এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা নামক নতুন মূল্যবোধের উদ্বোধন ঘটান। যেখানে একজন হতাশাগ্রস্ত লোক ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, যার কোন শেকড় নেই। যার ভেতরের কথাটা হচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজে বহিরাগতের মতো জীবন যাপন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তানের অভ্যুদয় একধরনের আত্মতৃপ্তিতে নিমজ্জিত হলেও বাস্তবে শহীদ কাদরী প্রথম উপলব্ধি করলেন বৈষম্যমূলক পাকিস্তানি শাসন ব্যবস্থা এবং অস্তিত্বের প্রবল সঙ্কট। সেইসাথে ষাটের দশকে আইউব সরকারের দমননীতি, মৌলিক গণতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন, নতুন শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রকাশে পূর্ববাংলার ছাত্র আন্দোলন বাঙ্গালির স্বায়ত্বশাসনের দাবি প্রভৃতি হল্লোরমুখরতায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল উত্তপ্ত।

(.বায়তুল্লাহ্ কাদেরী-বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিতা বিষয় ও প্রকরণ, নবযুগপ্রকাশনী, ঢাকা ২০০৯, পৃ. ৩৭,)

যুদ্ধ-বিগ্রহময় উত্তপ্ত বিশ্বের অস্থিতিশীল অবস্থার প্রেক্ষিত আমরা শহীদ কাদরীর কবিতায় দেখতে পাই। হত্যাযজ্ঞ সর্বত্রই বিরাজমান। প্রকৃতির নির্মল মুক্তির প্রতীক পাখির চিৎকার যেন সমগ্র জীব-জগতের বিপর্যস্ত জীবনের হাহাকার হয়ে প্রকাশিত তাঁর কবিতায়–

কোন সব রক্তাক্ত স্ট্রীটের বাঁকে/আর্মার্ড-কার নিয়ে কাতারে কাতারে কারা
দাঁড়িয়ে রয়েছে। কার্বাইনের চকচকে উদ্যত নল
নীলরঙা আকাশের নীচে, ঝলমলে শীতের দুপুরে
কার দিকে সুনিপুণ তাক ক'রে আছে,/কে কোথায় গড়াচ্ছে কোন পাঁচিলের পাশে
সদ্য গুলিবিদ্ধ কারা নদীর ভেতর থেকে /বুদ্বুদের ভাষায় প্রতিবাদ লিখে পাঠাচ্ছে বারবার
সকালে, দুপুরে কিম্বা সন্ধ্যায়/ সব কিছু ব'লে দেয় পাখির চীৎকার।

(শ.ক, প্রগুক্ত, পাখিরা সিগন্যাল দেয়, পৃ: ৮৫)

একদিকে মহাযুদ্ধ, অন্যদিকে পরম গ্লানিমাখা পরাধীনতা, সৈনিকদের কুচকাওয়াজ, যুদ্ধের তান্ডব, নৌসেনা ও স্থলসেনার বিকৃত যৌনতা, পয়সার বিনিময়ে সপ্তদশী মেয়ের সতীত্ব লুট -এই ছবিগুলোর মধ্য দিয়ে কবি শহীদ কাদরী বেড়ে উঠেছিলেন বলে, জীবনকে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার অভ্যাস তাঁর গড়ে উঠেছিল। তারই প্রকাশ তাঁর কবিতায় বর্তমান–

আমার মনে আছে ১৯৫২ এর স্লোগান চঞ্চল একুশের অপরাহ্ণ
আমি দেখেছি পাখির পালকের মতো হালকা এক
ভিখিরি বালকের মৃত্যু এক অমোঘ থ্রি-নট-থ্রির গুলিতে।
তার কথা একুশের ইতিহাসে লেখাজোখা নেই।

(শ.ক, আ. চু. পৌঁ. দা, একে বলতে পারো একুশের কবিতা, পৃ: ১৯)

ষাটের দশকের শেষের দিকে সামরিক শাসন বিরোধী বাঙালিদের আন্দোলনের বিপরীতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর অস্ত্রসজ্জা, সৈন্যসজ্জা ও যুদ্ধ-মহড়া, স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্বলিত কবিতাসমূহ আর স্বাধীনতা উত্তরকালের স্বাধীনদেশের যে নৈরাজ্য-নৈরাশ্য বিশৃঙ্খলা অবস্থায় জন্ম তা তাঁর *'তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা'* কাব্যে প্রকাশিত। সে সময়ের দেশকালের একটি স্বতন্ত্ররূপ যা একরোখা উচ্চারণ, যে উচ্চারণ ভোরের হাওয়ার মতো, তাঁর নিজেকে নির্মাণের দেশপ্রেমী চেতনার রশ্মি; যা অপ্রতিরোধ্য জোয়ার বিশেষ। যা শহদি কাদরীর কবিতায় প্রকাশিত–

যদিও বধ্যভূমি হল সারাদেশ রক্তপাতে আর্তনাদে
হঠাৎ হত্যায় ভ'রে গেল বাংলার বিস্তীর্ণ প্রান্তর
অথচ সেই প্রান্তরেই একদা ধাবমান জেব্রার মতো

জীবননান্দের নরম শরীর ছুয়ে উর্ধ্বশ্বাস বাতাসে রয়েছে। (শ.ক, প্রাগুক্ত, ব্ল্যাক আউটের পূর্ণিমায়, পৃ:৮৭)

এছাড়া নিষিদ্ধ জার্নাল থেকে, রাষ্ট্র প্রধান কি মেনে নেবেন, স্বাধীনতার শহর, তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা প্রভৃতি কবিতায় তাঁর স্বদেশোদ্দীপক উচ্চারণ নতুন মাত্রা ও অভিজাত্যে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। জীবনের প্রথমার্ধ স্বদেশে কাটালেও দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর কেটে গেল প্রিয় স্বদেশ থেকে বহুদূরে স্বেচ্ছানির্বাসনে।

শহীদ কাদরী ১৯৫২ এর শুরুর দিকে ঢাকায় আসার পর কালের ব্যাপকতায় দেশকালের আবর্তনে প্রকাশ করেন তিনটি কাব্যগ্রন্থ –*উত্তরাধিকার*, *তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা*, *কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই*। দেশে থাকাকালীন সময়ে শেকড়হীনতার সংকট, সাহিত্যিক রাজনীতি, দলবাজি, চালবাজির কবলে পড়ে ১৯৭৮ এর পর একদিন তিনি দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। পরে তিনি জার্মান, ইংল্যান্ড, লন্ডন, যুক্তরাষ্ট্রের বোষ্টনে, নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে আমৃত্যু কাটিয়ে দেন বিভুঁই মার্কিন দেশে। কবির দেশকাল পর্যবেক্ষণে কবির সাজাত্যবোধ তীব্রভাবে ফিরে আসে আমাদের কাছে। যার প্রেক্ষিতে কবি প্রকাশ করেন 'কোনো নির্বাসনই কাম্য নয় আর' কবিতাটি। যেখানে কবি শীত প্রধান দেশে থেকেও অনুভব করেন নিজ বাসভূমের মাটির উষ্ণ উত্তাপ। যে কারণে তাঁর কাছে বিদেশ মানেই নির্বাসন। নির্বাসনকে তিনি মৃত্যুতুল্য করে প্রকাশ করেছেন 'কোন নির্বাসন কাম্যই নয় আর' কবিতায়–

> কোনো নির্বাসনই কাম্য নয় আর / ব্যক্তিগত গ্রাম থেকে অনাত্মীয় শহরে
> হনন মও বিদেশী জনতার ব্যূহে /এই যে নির্বাসন - কাম্য নয় আর।
> (শ.ক, প্রগুক্ত, কোনো নির্বাসনই কাম্য নয় আর, পৃ: ৩৭)

কবি শহীদ কাদরী তার দেশকালের প্রেক্ষাপটে বেশকিছু মুক্তিযুদ্ধের কবিতা লেখেন। যেমন -ব্ল্যাক আউটের পূর্ণিমায়, নীল জলের রান্না, স্বাধীনতার শহর ইত্যাদি। যা'র ধরন শামসুর রাহমান, হুমায়ুন আজাদ কিংবা নির্মলেন্দু গুণের স্বাধীনতার কবিতার মতো নয় কিংবা পল এলুয়ারের 'লিবার্টি' বা গার্সিয়া লোর্কার ' দ্যা গোরিং এন্ড দ্যা ডেথ 'কবিতা থেকে আলাদা। কারণ–

> উজ্জ্বল কিশোরকে ফের কবিতার আঁতুড় ঘর, মেঘের গহ্বর,
> আর আমাকে ফিরিয়ে দিলে মধ্যরাত পেরুনো মেঘলোকে ডোবা সকল রেস্তোরাঁ।
> (শ.ক, প্রাগুক্ত-স্বাধীনতার শহর, পৃ: ৮৮)

'যুদ্ধোত্তর রবিবার' এর এই ঘটনা আমাদের আবেগকে সংযত রেখে অনায়াসে এক যুদ্ধ থেকে চিরায়ত আরেক যুদ্ধের কথা বলে যায়। পশুত্ব ও মানুষের অন্তরে লালিত লেলিহান সাধের কথা এতোটুকু বুঝতে না দিয়ে। দেশ

মাতৃকার প্রতি অকৃত্রিম টান কবিকে মৃত্যুর পরে স্বদেশের মাটিতে ফিরিয়ে এনেছিল এবং তাঁকে কবরস্থ করা হয়েছে মিরপুর বুদ্ধিজীবী গোরস্থানে। ত্রিকালদর্শী এ কবি তাঁর সৃজনকর্মের মাঝে বেঁচে আছেন, বেঁচে থাকবেন। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র আর্তবেদনায় কবি তাঁর শিকড়ের দিকেই ফিরতে চেয়েছেন–

আমার মতন ভ্রাম্যমাণ এক বিহ্বল মানুষ/ ঘরের দিকেই
ফিরতে চাইবে।/ হ্যাঁ এটাই সবচেয়ে সুস্থ
সহজ এবং স্বাভাবিক।
(শ.ক, প্রগুক্ত, নিরুদ্দেশ যাত্রা, পৃ:৬২)

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ কবিমানস

পঞ্চাশের দ্বিতীয়ভাগে কূপমন্ডুকতামুক্ত, নির্মোহ, বুদ্ধিদীপ্ত ও নিজস্বতায় আবর্তিত অনন্যকান্তি কবিপুরুষ শহীদ কাদরী জন্মসূত্রে কলকাতায় মিশ্র সংস্কৃতিতে বাল্যকাল ও কৈশোর অতিবাহিত করেছেন। কলকাতার মিশ্র সংস্কৃতি ও ইংরেজি ভাষায় লেখাপড়া, বিশেষত খ্রিষ্টীয় সন্ন্যাসীদের কাছে শৈশবের দীক্ষা গ্রহণ কবির কবিমানস সৃজনে দিয়েছে স্বতন্ত্র মাত্রা। পিতৃপুরুষের শেকড় বর্ধমানের বটগ্রামে- যে বর্ধমানে জন্ম কবি নজরুলেরও। ছন্নছাড়া নজরুল আর ছন্নছাড়া শহীদ কাদরী দু'জনেই শেকড় ছেড়ে বেরিয়েছেন। কলকাতার শৈশব, ঢাকার তারুণ্য আর যৌবন, বার্ধক্যে জার্মানি, ইংল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্রে কাটিয়ে দেয়া শহীদ কাদরী।

শহীদ কাদরীর দাদা আমির উদ্দিন আহমেদ কাদরী ছিলেন প্রথম জীবনে স্কুল ইনস্পেক্টর এবং পরবর্তীকালে ম্যাজিস্ট্রেট। বাবা খালেদ ইবনে আহমদ কাদরীর কর্মজীবনের প্রথম দিকে ছিলেন 'দ্যা ষ্টার অব ইন্ডিয়া' পত্রিকার নিউজ এডিটর এবং পরে পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকার চাকুরি ছেড়ে পরে খালেদ ইবনে আহমেদ যোগ দেন ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল কমিটির ডিরেক্টর জেনারেল হিসাবে। বর্ধমানের মানুষ শহীদ কাদরীর মা ফার্সি ও উর্দু ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। শহীদ কাদরীর পৈতৃক নিবাস ছিল সিরাজগঞ্জে। শহীদ কাদরীরা ছিলেন দুই ভাই এক বোন। ছয় বছরের বড় অগ্রজ শাহেদ কাদরী ছিলেন বিদ্বান, বিচক্ষণ ও সাহিত্যানুরাগী, বোন নাফিসা কাদরী এবং পরিবারের ছোট ছেলে ছিলেন কবি শহীদ কাদরী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পার্ক সার্কাস মাঠে আর্মির টেঞ্চ, খিদিরপুর ডক ইয়ার্ডে বোম্বিং, ভোর বেলায় আর্মির বিউগল বাজিয়ে কুচকাওয়াজ, নিগ্রো সৈনিকের গণিকার হাত ধরে রাস্তা পার হয়ে যাওয়ার দৃশ্য, কলকাতা লাইট হাউসে বোমা বিস্ফোরণ প্রভৃতি দৃশ্য ফুপুর মরিস টোয়েন্টিফাইভ গাড়িতে চড়ে দেখে দেখে বালক শহীদ কাদরীর কচি মনে এক গভীর ছাপ ফেলে। যুদ্ধ, ক্ষমতার লড়াই, দাঙ্গা, মানুষের সাথে মানুষের ভেদাভেদ এসব কিছু শহীদ কাদরীর ছোট মনে জীবন সম্পর্কে অন্যরকম এক ধারণা তৈরী করে। যা সমকালীন বাস্তবতার কঠিন দৃশ্যগুলো তাঁর নিস্পাপ চোখে অবাক বিস্ময়ে তাঁর মানস গঠনে নতুনদিগন্ত যোগ করে। শহীদ কাদরী যে দু'জন শিক্ষক এর কাছে হাতে খড়ি নেন তারা হলেন – আবদুর রহিম এবং আবদুল গণি। শিক্ষক আবদুল গণির কাছ থেকেই শহীদ কাদরী প্রথম বাংলার স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণ দীক্ষা নেন এবং সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি হন ১৯৬৪ সালে।

বইপ্রেমী শহীদ কাদরী ছেলেবেলাতেই মা'র ট্রাঙ্ক থেকে লুকিয়ে পড়ে ফেলেছিলেন শরৎ উপন্যাস। সাত-আট বছর বয়সেই তাঁর পড়া হয়ে যায় অল্ কোয়ায়েট অন দ্যা ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট, আম আঁটির ভেঁপু, আবোল-তাবোল, ওয়েস্টার্ন কমিক্স্, রয় বর্জাস, কমিক্স, জেন অটরি, ক্যাপ্টেন মারবল, প্লাস্টিক ম্যান ইত্যাদি। এভাবে একদিন ধীরে ধীরে পড়ে ফেলেন তাঁর বয়সের তুলনায় একটু ভারি গোছের সাহিত্য 'ল্যা মিজারেবল'। তখন কলকাতায় ছিল হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। শহীদ থাকতেন মুসলমান পাড়া বলে খ্যাত 'পার্ক সার্কাসে'। ভয়াবহ দাঙ্গার এই স্মৃতিগুলো বুকে নিয়ে শহীদ কাদরী তাঁর বালক বয়স থেকে কৈশোরে পা রাখেন। পিতা খালেদ ইবনে আহমদ (৪২ বছরে) ১৯৫২ সালে মৃত্যুর পর কাদরী পরিবারে নেমে আসে ভয়াবহ বিপর্যয়। একদিকে ভয়াবহ দাঙ্গা, জীবনের অনিশ্চয়তা, অন্যদিকে বাবার মৃত্যু। কাদরী পরিবারে এ সঙ্কটময় মুহূর্তে প্রস্তাব আসে -মামা বাড়ি বর্ধমানে চলে যাবার। কিন্তু শহীদের একমাত্র ফুপু হামিদা বখ্ত্ -এ প্রস্তাবে রাজী হন না। তিনি তখন আসামে চা বাগান বিক্রি করে সিলেট চা বাগান কিনে পূর্ব বাংলার স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন। তাঁর ইচ্ছা শহীদ কাদরীর পরিবারের সবাই যেন দ্রুত ঢাকায় চলে আসে। যে কারণে একদিন খুব গোপনে এক কাকডাকা ভোরে সবাই পা বাড়ালেন কলকাতার দমদম এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে। এভাবে ১৯৫২ সালে পার্ক সার্কাসের সেই চিরচেনা বাড়িটিকে পেছনে ফেলে চলে আসতে হয় নতুন ঠিকানা ৭/এ দিলকুশা ঢাকার নতুন ঠিকানায়।

আড্ডাপ্রিয় শহীদ কাদরীর ঢাকায় এসে জুটে গেল নতুন বন্ধু -বান্ধব। বন্ধু নুরুল হক বাচ্চু, ফুফাত ভাই জাহাঙ্গীর এদের সাথেই ঘুরে বেড়াতে শুরু করেন ঢাকার অচেনা অলিতে-গলিতে। বই কিনতে যান বাংলা বাজারের নওরোজ কিতাবিস্তানে। খান মজলিসের পত্রিকার বুকষ্টলে পাওয়া যেত চতুরঙ্গ, পরিচয়, চতুষ্কোণ, পূর্বাশা, সাহিত্য পত্রিকা। বই আসত কালকাতার ফুফাত ভাই আনিস চৌধুরী, রশীদ করিমের কাছ থেকে। সেই সাথে কলকাতা থেকে ভাগ্নি মেরিনা ওদুদ প্রচুর বই পাঠাতে থাকেন । হুমায়ুন কবির আবুল হায়াত, সাদেক তাঁদের কাছ থেকেও প্রচুর বই তিনি পান। বইপড়ুয়া কবি শহীদ কাদরীর প্রিয় কবি শেলি, স্পেন্ডার, বায়রন। এদিকে বড় ভাই শাহেদ কাদরী জার্মান সাহিত্যের অন্ধ ভক্ত হলেও তিনি ক্রমশ ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি আসক্ত হয়ে পরেন। ইংরেজি সাহিত্যে নিমজ্জিত এই বালক তথা শহীদ কাদরী ক্রমন্বয়ে চোখ মেলে তাকান বাংলা সাহিত্যের অফুরন্ত ভান্ডারের দিকে। মাত্র তেরো-চৌদ্দ বছর বয়সেই পড়তে শুরু করেন রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল, বঙ্কিম, বিষ্ণুদে, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন দত্ত, সুকান্ত, আর ঠিক তখনই অপার বিস্ময়ে বাংলা সাহিত্যের ঝাঁপিটি আবিষ্কার করেন। শুরু হয় শহীদ কাদরীর গোপন কাব্যচর্চা। শহীদ কাদরীর কবি পরিচয় স্পষ্ট রূপ নেয় পূর্ব বাংলার লিটল ম্যাগাজিন 'সপ্তক' এর কাল থেকেই। যদিও শহীদ কাদরী লেখালেখি শুরু করেন নিতান্ত ছোট বয়সে অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় - নাটক লেখার মাধ্যমে। তারপর প্রবেশ করেন কবিতায়। এগারো বছর বয়সে ১৯৫৩ সালে তিনি 'পরিক্রমা' শিরোনামে প্রথম কবিতা লেখেন। যা মহিউদ্দিন আহমদ সম্পাদিত 'স্পন্দন 'পত্রিকায় প্রকাশিত

হয়। প্রথম দিকে তাঁর লেখার উপর সুকান্ত এবং মঙ্গলাচরণের ভাবধারার প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকলেও পরবর্তীতে পূর্বাশা, চতুরঙ্গের প্রভাবে শহীদ কাদরীর কবিতার শরীরে উঠে আসে রোমান্টিকতা। ১৯৫৪ সালে মঙ্গলাচরণ ধারার চতুরঙ্গে ছাপা হল 'জলকন্যার জন্যে'। একই বছর 'পূর্বাশাতে' ছাপা হয় 'গোধূলির গান'।

চতুরঙ্গে প্রকাশিত প্রথম কবিতাকে কেন্দ্র করেই সদরঘাটে খান মজলিশের বইয়ের দোকানে শহীদ কাদরীর সাথে কবি শামসুর রাহমানের পরিচয় ঘটে। এরপর তাঁরা বইয়ের দোকান থেকে পুরনো ঢাকার বিখ্যাত রিভারভিউ রেস্তোরাঁয় যান। যদিও শামসুর রাহমান শহীদ কাদরীর চেয়ে চৌদ্দবছরের বড়, তারপরও তাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বের। কবিতা নিয়ে চলত দিনরাত আড্ডা। প্রথম প্রথম এই আড্ডা বসত শামসুর রাহমানের বাসায়। কখনো রিভার ভিউ ক্যাফেতে। পরবর্তীতে এই আড্ডায় যোগ দেন ফজল শাহাবুদ্দিন, সৈয়দ শামসুল হক, বেলাল চৌধুরী, মাহমুদুল হক (বটু) আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, আল মাহমুদসহ অনেকেই। আড্ডা প্রথম দিকে চলত বিউটি বোর্ডিংয়ে, কখনো রেক্সে, চুচিং চাউ রেস্তোরাঁয় অথবা স্রেফ ফুটপাতে।

শহীদ কাদরীর কবিমানস গঠনে তথা কবিতা লেখার শুরুর দিকে তিনি জীবনানন্দের একটি প্রবন্ধ দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হন। যেখানে কবি কবিতার শরীরকে কবির চিন্তা ভাবনা এবং মেধার স্বাক্ষর তথা নারীর কটাক্ষের পেছনে শিরা উপশিরার মতো বলেছেন। অর্থাৎ কবিতার মাঝে থাকবে কবি ও তাঁর কল্পনা,আর কল্পনার মধ্যে অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতার ভিতরে স্বপ্ন, তবেই হবে কবিতা। এ প্রসঙ্গে শহীদ কাদরীর শিক্ষণ–

> কবিতা হলো সত্যশিব সুন্দরের ব্যাপার, আর সৃষ্টিক্ষম প্রজ্ঞাই হলো কবি। আর এই প্রজ্ঞা আসে জীবনবীক্ষা থেকে।
>
> (মুহিত হাসান: শহীদ কাদরীর সাথে কথাবার্তা, বাতিঘর সংস্করণ: অক্টোবর -২০১৬)

১৯৫৬ সালে বুদ্ধদেবের 'কবিতা' পত্রিকাতে 'এই শীতে' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এটাই ছিল তাঁর কবি জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। এরপরে প্রকাশিত হয় 'নির্বাণ' কবিতাটি। 'এই শীতে' কবিতাটি প্রকাশিত হবার পর থেকেই কবি অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে লিখতে শুরু করেন। ফলে ঢাকার সাহিত্যাঙ্গনের সঙ্গে তাঁর সহজ যোগসূত্র ঘটে। শহীদ তাঁর কবিমানস সৃষ্টির মানসিকতায় ষাটের দশকের অত্যাধুনিক বিদ্রোহী লেখক গোষ্ঠীর অনেক কাছাকাছি ছিলেন। মূলত জীবনবোধের অভিজ্ঞতার কারণেই ষাটের কবিরা প্রথাবিরোধী হয়েছেন। এরপর বাংলা কবিতায় মাইকেল ও তিরিশের আধুনিকতাকে মনেপ্রাণে ধারণ করে শহীদ কাদরী তাঁর কাব্যযাত্রা শুরু করলেও বিশ্বপ্রেক্ষাপটে তাঁর কাব্যদর্শনকে মিলিয়ে নিতে তিনি অভিলাষী হন। যেকারণে পাশ্চাত্য কবি ও দার্শনিকদের দ্বারা কবি দারুণভাবে প্রভাবিত হন। আর তা্ই শহীদ কাদরীর সৃজনীক্ষমতা বিকশিত হয়েছিল দর্শন, নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্বের সাথে বিজ্ঞান ও ইতিহাসচর্চায় গভীর মনোনিবেশের মাধ্যমে। বোহেমিয়ান, আড্ডাপ্রবণ, উদ্দাম স্বভাব

আর অকপট ভাষণ শহীদকে করে তুলেছিল কিংবদন্তিতুল্য। তাই সময়ের ব্যবধানে বিউটি বোর্ডিং, রেকস্, রায়সাহেব বাজার নিউমার্কেটের আড্ডার প্রাণ প্রতীম হয়ে উঠেন শহীদ কাদরী।

সময়ের পরিক্রমায় শহীদ কাদরী ১৮/১৯ বছরের সময় মোশারফ রসুল বুড়োর সাথে পরিচয় সূত্রে ছন্নছাড়া জীবনের দিকে ধাবিত হন। পরিচয় হয় আরেক বন্ধু শহীদুল হাসান জ্যোতির সাথে। তার সূত্র ধরে পরিচয় ঘটে সুকুমার মজুমদার ও খালেদ চৌধুরীর সাথে। যাঁদের সান্নিধ্যে শহীদ কাদরীর জীবনের দর্শন একেবারে পাল্টে যায় এবং তিনি মার্কসবাদের পাশাপাশি পাশ্চাত্য দর্শন ও পশ্চিমা ধ্রুপদী সংগীতের প্রতিও আকৃষ্ট হয়ে ওঠেন। তখন প্লেটোর ধারনানুযায়ী শহীদ কাদরীর কাছে সত্যের অনুসন্ধানই মানুষের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলে বোধ হয় আর কবিতাকে মনে হয় বায়বীয় ব্যাপার। তখন তিনি ভাবতে শুরু করেন কবিতা দিয়ে মানুষের মুক্তি সম্ভব নয়।

আধুনিক যুগে সত্যের অন্বেষণই হলো বিজ্ঞান আর দর্শন। অর্থাৎ শহীদ কাদরী প্লেটোর 'রিপাবলিককে' নির্বাসিত কবিদের মত নিজেকেও কাব্যজগত থেকে ১৯৫৮ -১৯৬৩ সাল অবধি বিযুক্ত রাখেন। পরে সৈয়দ শামসুল হকের *'একদা এক রাজ্যে '* কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা লেখা সূত্রে তিনি ১৯৬৩ সালে ঢাকার এক বর্ষণ মুখর দিনে রচনা করেন কবিতা 'বৃষ্টি বৃষ্টি'। কবিবন্ধু আল মাহমুদ দ্বিতীয় প্রুফের সুযোগ না দিয়ে তা ছেপে দিলেন 'সমকাল' পত্রিকায়। এখানে 'বৃষ্টি বৃষ্টি' এলিয়েশন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে । এ কবিতাকে কবি তাঁর জীবনের 'ওয়েস্ট ল্যান্ড' বলেছেন, যা এলিয়েটের - 'ওয়েস্টল্যান্ডের' মত তুলনীয়। যারা অত্যাচারী তারা সবসময় ভীতু, আর বৃষ্টির জল ধুয়ে মুছে দিচ্ছে আমাদের সমস্ত পাপচিহ্ন। কবিমানসের বিকাশের ধারায় 'সপ্তকের' দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকশিত হয় কবিতা– টেলিফোনে আরক্ত প্রস্তাব, পাশের কামরায় প্রেমিক ও চন্দ্রালোকে । এর পর ১৯৬৭ সালে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে *'উত্তরাধিকার'* (৪০টি) কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। যাতে যুগ যন্ত্রণার ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত হৃদয়ের আর্তনাদ প্রকাশিত। *'তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা'*(৩১টি) ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত, যাতে কবিসত্তার বোহেমিয়ান স্বভাবকে রাষ্ট্রীয় জীবনের সাথে একাকার করে দিয়েছেন। *'কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই'* (৩৫টি) ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত , যাতে আছে বোহেমিয়ান সুর। *'আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও'* (৩৭ টি) ২০০৯ সালে প্রকাশিত ,যাতে রয়েছে প্রবাসজীবনের বেদনা এবং দেশের জন্য আকুতি, ব্যক্তি জীবনের খেদ, গ্লানি, হাতাশা, বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতা । মৃত্যু পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ *'গোধূলির গান'* (২৩+ভাষান্তর–১৩টি) ২০১৭ সালে প্রকাশিত, যাতে আছে বিরূপ বিশ্বের বোহেমিয়ান কবি শহীদ কাদরীর রক্তক্ষরণ আর বেদনার গান। যাযাবর প্রবণতার কারণে নিঃসঙ্গকে সঙ্গী করে শহীদ কাদরী সন্ত্রস্ত কলকাতা থেকে গৃহচ্যুতি হন। যা তাঁর সমগ্র জীবনের বাতাবরণে তথা কবিমানস গঠনের সঙ্গীতানুরাগের অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে। সৃষ্টিশীল কবি মানুষ সময়-অসময়ের উর্ধ্বে উঠে শুভ ও কল্যাণ চেতনাকে প্রকাশ করেন তার কর্মের হাতিয়ার রূপে। যার প্রকাশিতরূপ –

আমাদের লাল, নীল, সবুজ পাতাগুলো,/আমাদের প্রিয় পাতাগুলো ঝরে পড়ছে,

স্বাধীনতাযুদ্ধের সৈনিকদের মতো ঝরে পড়ছে,/শুধু পাতা ঝরার আর্তনাদ

শুধু পাতা ঝরার শোকার্ত চিৎকার চতুর্দিকে।/অথচ সমস্ত পৃথিবীর ঝরা পাতাদের চিৎকার ছাপিয়ে...

জলোচ্ছ্বাসের পরের প্রথম ভোরের/আজানের মতো,/কবি তার উত্থানের গানটি গাইবে/ (শ.ক, প্রাগুক্ত, এখন সেই সময়, পৃ:১৪)

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ : শহর চেতনা

বিশ শতকের শেষ পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে তিরিশের উত্তরাধিকার এবং সমাজ মনস্কতার দ্বৈতাবেশে এ ভূখন্ডের কবিতার স্বতন্ত্র চরিত্র যার কবিতায় প্রতিভাত হয়, তিনি হলেন কিংবদন্তি নাগরিক কবি শহীদ কাদরী। আঠারো শতক থেকে যন্ত্রবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ গ্রাম থেকে শহরে জড়ো হয়েছে। বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল থেকে নগরচেতনার যে লক্ষণগুলি চিহ্নিত হয় তা হলো – আত্মকেন্দ্রিকতা, নৈঃসঙ্গ্য, বিচ্ছিন্নতাবোধ, অবক্ষয় চেতনা, প্রেমারতি, রিরংসা, ঘৃণা, আত্মরতি, বিকার প্রভৃতি। প্রত্যক্ষ আত্মিক নগরদৃষ্টি তাঁর কবিতায় পেয়েছে স্বতন্ত্র কাব্যভাষা। শহীদ কাদরীর দীপ্র আধুনিকতা, বাক্‌ভঙ্গির বিশিষ্টতা, গভীর জীবনবোধ, অর্ন্তগত বিষাদ ও বৈরাগ্যের পথ ধরে বাংলাদেশের কবিতায় নাগরিক চেতনায় ঢাকা কেন্দ্রিক নগর নয় বিশ্ব নাগরিক বোধের শূন্যতার নতুনমাত্রা যোগ করেছে।

হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার তথা দেশ ভাগের জন্য শহীদ কাদরী জন্মভূমি ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে আসেন ঢাকায়। এদিকে এপার বাংলায় ভাষা আন্দোলন নিশ্চল হতে হতে দীর্ঘ সেনাশাসন ও স্বাধিকারের সংগ্রাম থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয় অগণিত শহীদের রক্তক্ষয়ী আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে। সৃষ্টিশীল কবি-বিদেশ গমন, প্রেম ভালোবাসা আর দেশের জন্য সবসময় চরম ও পরম আকাঙ্ক্ষা এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দেশে না ফেরা- এসবের মধ্যে বিস্তৃত বিধৃত ও বিবর্তিত আজীবন কলকাতা, ঢাকা, বার্লিন, বোস্টন ও নিউইর্য়কে জীবন অতিবাহিত করেন। যে কারণে তাঁকে নাগরিক চেতনার একজন প্রথম সারির উন্মেষকারী কবি বলে চিহ্নিত করা হয়। সেই সাথে তাঁর কবিতাকে নগরজীবনের টানাপোড়েন, জটিলতা, সংগ্রাম ও বেদনার বিষয়াবলীর আমোঘ দলিলও বলা হয়। তাঁর বিভিন্ন কবিতায় বিচিত্রভাবে নগরোপকরণ এসেছে– রেসকার্সের কাঁটাতার, কারফিউ, জিপ ১৪৪ ধারা, প্যামফ্লেট, পোস্টার, মাইক্রোফোন, রেফ্রিজারেটর, সেলুন, রেস্তোরাঁ, রেকর্ড প্লেয়ার, টেক্সি পার্ক, পেভমেন্ট ইত্যাদি। নাগরিক চেতনার ব্যবহারিক প্রকাশের ক্ষেত্রে কবি রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিকে আমাদের জীবনের ট্রাফিক আইল্যান্ড রূপে চিত্রায়িত করেন। যা 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতায় প্রকাশিত–

> আমাদের চৈতন্য প্রবাহে তুমি ট্রাফিক আইল্যান্ডে , হে রবীন্দ্রনাথ ।...
> তুমি সে রাতের পার্কে আমার আলোজ্বলা অন্তিম রেস্তোরাঁ।
> (শ.ক, প্রগুক্ত, রবীন্দ্রনাথ, -৭৭পৃঃ)

এভাবেই শহীদ কাদরীর কবিতায় ব্যক্তি ও সমষ্টি তথা আমার ও আমাদের মিলেমিশে একাত্মতায় বেড়ে ওঠা নগরচেতনার দুই বাহু। ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাবোধ তাঁর শহর জীবনের বিশিষ্টতা। যা 'সঙ্গতি' কবিতায় পরিলক্ষিত

হয়। 'সঙ্গতি' কবিতায় আধুনিক ও নাগরিক মানব মনের অপূর্ণতা, জটিলতা, জনবিচ্ছিন্নতা তথা সব প্রাপ্তির পরেও নাগরিক মন যে শেষ পর্যন্ত তার শান্তির শ্বেত কপোতটি ওড়াতে বারবার ব্যর্থ হয়ে যায়–তারই ছবি দেখা যায়।

নাগরিকতা আধুনিকতার প্রধান শর্ত। আধুনিক শব্দটি আপেক্ষিক। রবীন্দ্র -নজরুলের উত্তরকালই হচ্ছে আধুনিক বাংলা কবিতার উন্মেষকাল। আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ-সব ধরণের সংস্কার বর্জন। আধুনিকতার উৎস হচ্ছে মধ্যযুগীয় সংস্কার ও সংকীর্ণতা থেকে ক্রমোত্তরণ তথা কূপমন্ডূকতা থেকে মুক্তি। শেলী, কিট্স্ তাঁদের যুগে আধুনিক ছিলেন। আধুনিকতা সূচিত হয় - কালের বিচারে নয় মেজাজের বিচারে। আবু সায়ীদ আইয়ুব তাঁর আধুনিক কবিতা সংকলনে (১৯৪০) আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা দিয়েছেন,–

> কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী, ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত, অন্তত মুক্তিপ্রয়াসী কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করছি। ভাবের দিক থেকে আধুনিক কবিতার লক্ষণ নিম্নরূপ- (১) নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাত (২) বর্তমান জীবনে ক্লান্তি ও নৈরাশ্যবোধ (৩) আত্মবিরোধ ও অনিকেত মনোভাব(Rootlessness) (৪) বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থেকে সচেতন গ্রহণ (৫) ফ্রয়েডীর মনোবিজ্ঞানের প্রভাবে অবচেতন মনের ক্রিয়াকে প্রশ্রয় দেয়ার ফলে চিন্তাধারার অসম্বদ্ধতা (৬) ফ্রেজার প্রমুখনৃতাত্ত্বিক ও প্লাঙ্ক ,বোর, আইনস্টাইন প্রভৃতি আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানীর প্রভাব (৭) মার্কসীর দর্শনের বিশেষত সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রভাবে নতুন সমাজ সৃষ্টির আশা (৮) মননধর্মীতা (৯) বিবিধ প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধে যেমন প্রেম, সুন্দর, কল্যাণ, ধর্ম,সংশয় এবং তৎসঞ্জাত অনিশ্চয়তার উদ্বেগ। (১০) দেহজ কামনা, বাসনা ও তৎপ্রসূত অনুভূতিকে স্বীকার করা এবং প্রেমের শরীরী রূপকে প্রত্যক্ষ করা (১১) ভগবান ও প্রথাগত নীতিধর্মে আবিশ্বাস (১২) রবীন্দ্র ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহ ও নতুন পথের সন্ধান অর্থাৎ উল্লেখিত আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য নাগরিক চেতনারই ফসল।
>
> (শহীদ কাদরীর কবিতায় নাগরিক চেতনা–বুলান্দ জাভীর, ইকবাল হাসান-১৩৪ পৃঃ)

স্বল্পপ্রসূ কবি শহীদ কাদরী। তাঁর প্রকাশিত পাঁচটি কাব্যগ্রন্থে সামগ্রিক ভাবে নগরচেতনাই অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। আধুনিক নগর জীবনের প্রাত্যহিকতার যন্ত্রণা ও ক্লান্তির অভিজ্ঞতা এবং নগর সভ্যতার বিকারকে তিনি তাঁর কবিতার মূল উপজীব্য করে কবিতায় দৃশ্যমান করেছেন। তবে তাঁর শিল্পরুচি সেই বিকারে প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হলেও তাতে তিনি বিপর্যস্ত হননি কিংবা পরাজয় মানেননি। কবির প্রতিটি কবিতায় পাওয়া যায় তাঁর গভীর অনুভবের ছোঁয়া, সূক্ষ্ম চিন্তার ছাপ এবং নাগরিক পরিপাট্য ও পরিচর্যার পরশ। শহীদ কাদরীর কবিতায় নাগরিকতার সঙ্গে শিল্প বিপ্লবোত্তর লন্ডন - প্যারিস নগর জীবনচিত্রের সাদৃশ্যই বেশি পরিলক্ষিত হয়।

বিজ্ঞান সম্মত বিশ্ববীক্ষার অভিঘাত পড়েছে যে চৈতন্যের ওপর তাকেই আমরা আধুনিক আখ্যা দিই। বাঙালি চৈতন্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের সাক্ষাৎ ঘটার ফলেই আধুনিক বাঙালির মানসের উন্মেষ ঘটে। বিজ্ঞান ও নাগরিক বোধের সমন্বয়ে আর্ন্তজাতিকতার রূপমুগ্ধ কবি বার বার শহরের বন্দনা গান গেয়েছেন। অর্থাৎ আধুনিক শিল্পের

ভিত্তিভূমি হচ্ছে বিশ্বব্যাপী বুর্জোয়া, গণতন্ত্রের উত্থান এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা নামক নতুন মূল্যবোধের উদ্বোধন। যা তাঁর প্রথম কাব্যের 'বৃষ্টি বৃষ্টি' কবিতারই মূল সুর–

রাজত্ব,রাজত্ব শুধু আজ রাতে, রাজপথে -পথে/বাউন্ডুলে আর লক্ষ্মীছাড়াদের, উন্মুল, উদ্বাস্তু
বালকের, আজীবন ভিক্ষুকের, চোর আর অর্ধ-উন্মাদের/বৃষ্টিতে রাজত্ব আজ ....
(শ.ক, উত্তরাধিকার, বৃষ্টি বৃষ্টি–পৃ: ১১)

মূলত নাগরিক কবিতার সূচিমুখ তৈরী হয় বোদলেয়ারের হাতেই। বোদলেয়ারের নগর এক নারকীয় উল্লাস, ডাকিনি আর প্রেতিনির উন্মুক্ত উরুর শব্দে রাত্রিময়, নপুংসক আত্মায়, বেশ্যালয়ে পাপমোচনে প্রশস্ত রাত্রি যাপন। যেখানে প্রচ্ছন্নভাবে বোদলেয়ারীয় নাগরিক চেতনায় কুৎসিতের ভেতর সুন্দরকে দেখেছেন। সেইসাথে এলিয়ট নগরকে একেঁছেন উষর কর্দমাক্ত বিকলাঙ্গতায়, যুদ্ধোত্তর মানুষের পঙ্গুত্বে প্রায় ক্লীব এবং সৃষ্টি সম্ভাবনা হীনতায়–'দ্যা ওয়েস্টল্যান্ডে' তার পরিচয় আছে। এসব উত্তরাধিকার শহীদ কাদরী বহন করেছেন তাঁর কাব্য মেজাজে। তাঁর নাগরিকতা তথা শহরচেতনার মূলে আছে অর্জিত জ্ঞানের অন্তরসৃষ্টি প্রক্রিয়া, যা নাগরিক উৎকর্ষে উত্তীর্ণ কবির জন্মস্থান কলকাতা শহরের উত্তরাধিকার সূত্রে রচিত কাব্যগ্রন্থ *'উত্তরাধিকার'* তা যেন তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত নগরচেতনারই এক শুদ্ধতমরূপ। অর্থাৎ তাঁর কাব্যস্বভাব যেন হয়ে উঠেছে দ্বিতীয় যুদ্ধান্তিক শহর মনস্ক জীবনবীক্ষারই নামান্তর। *'উত্তরাধিকার'* কাব্যের কবিতা 'বৃষ্টি বৃষ্টি' তে কবি শহরে বৃষ্টির অতিপ্রাত্যহিকতার অনুষঙ্গ উপস্থাপন করেছেন। সেটাকে শহীদ কাদরী তার ওয়েস্টল্যান্ড বলেছেন- যা দিগ্বিদিক ছুটোছুটিতে আর অজানা আশঙ্কায়-আকস্মাৎ মানুষকে সন্ত্রস্ত করে তোলে। এ কবিতায় - সামান্য বৃষ্টি ভেজার আপদ থেকে পালানোর ভঙ্গির মধ্যে আছে আরশোলার মত বেঁচে থাকার আত্মকেন্দ্রিক ভাবনা, যা নগরজীবনের বৈশিষ্ট্য। সেইসাথে সমস্ত ভাসানোর গল্পে শহরচেতনার এক নিঃসঙ্গ অস্তিত্বের প্রবল উপস্থিতির টের পাওয়া যায় –

শহরে প্রভু, বর্ষায়, বিদ্যুতে/ নগ্নপায়ে ছেড়া পাৎলুনে একাকী
হাওয়ায় পালের মতো শার্টের ভেতরে/
ঝকঝকে, সদ্য , নতুন নৌকার মতো একমাত্র আমি। (শ.ক, প্রাগুক্ত, বৃষ্টি বৃষ্টি, পৃ:১১)

বোধের বিপরীত, শত্রুভাবাপন্ন প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্জিত এক অভিশপ্ত নগরীতে কবির জন্ম। সেই সময়ের মানবিক ও মানসিক সংকট এবং সার্বিক রাষ্ট্রীয় সংকট যা ব্যক্তিক নগরজীবনের হতাশার চিত্র হয়ে ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতায় -

আমার বিকট চুলে দুঃস্বপ্নের বাসা ? সবার আত্মার পাপ

আমার দু'চোখে শুধু পুঞ্জ পুঞ্জ কালিমার মতো লেগে আছে?
জানি, এক বিবর্ণ গোষ্ঠীর গোধূলির শেষ বংশজাত আমি।
(শ.ক, প্রাগুক্ত, নপুংসক সন্তের উক্তি, পৃ:-১৪)

কবির কণ্ঠে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে বিতৃষ্ণা ও নাবাচকতা, যা নাগরিকতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। শহীদ কাদরীর কবিতায় বহুমাত্রায় শহর চেতনা ছড়িয়ে আছে -বিতৃষ্ণা, নিঃসঙ্গতা, হতাশা- অবিশ্বাস-ক্লান্তি অপ্রসন্ন বিপন্ন বিদ্যুৎ ময়ুরের মতো বর্ণালী চিৎকার, সভ্যতার ভবিষ্যতহীন নানা স্মৃতি, অনুর্বর মহিলার উদরের মতো আর্ত উৎকণ্ঠিত ভীড়াক্রান্ত বিব্রত বর্বর উর্ধ্বশ্বাস, প্রেতার্ত পূর্ণিমা, নির্বীজ চাঁদ, রুগ্ন উরু প্রেমিকার, নিস্বপ্ন চোখ, ম্লান মুখ, নির্বোধ আনন্দ গান, অনাত্মোৎসব, আত্মার ভেতরে ওড়ে নীল মিছিল বিরক্তির, প্রেমিক প্রেমিকার সাথে মিলবে ঠিকই কিন্তু শান্তি পাবে না, পাবে না (সঙ্গতি) ইত্যাদি উদাহরণ।

শহীদ কাদরী নগরেরই বাউল। তিনি নজরুলের মতই স্বভাবজাত বাউন্ডুলে তথা পাখিসম বোহেমিয়ান, যার অনন্যদৃষ্টান্ত তাঁর *'উত্তরাধিকার'* কাব্যের শেষ কবিতা 'অগ্রজের উত্তরে' প্রকাশিত-

না, শহীদ সেতো নেই; গোধূলিতে তাকে
কখনো বাসায় কেউ কোনদিন পায়নি, পাবে না।...
না, না, তার কথা আর নয়, সেই
বেরিয়েছে সকাল বেলায় সে তো-শহীদ কাদরী বাড়ি নেই।
(শ.ক, প্রাগুক্ত, অগ্রজের উত্তর,পৃ:৬২)

শহীদ কাদরীর নাগরিকতা বোধের স্নিগ্ধতা শামসুর রাহমানের চেয়ে অনেক বেশি নাগরিক চৈতন্য দ্বারা পিষ্ঠ। তার প্রমাণ–নপুংসক সন্তের উক্তি, আমি কিছুই কিনব না, পাশের কামরার প্রেমিক, নির্বাণ, আলোকিত গণিকাবৃন্দ ইত্যাদি কবিতায় প্রকাশিত। নগরের অন্ধকারে প্রদীপ্ত নক্ষত্রের আলোর মতো কবি আবিষ্কার করেন আলোকিত গণিকাবৃন্দকে। এই গণিকাবৃন্দ কবিকে অলৌকিক আহ্বানে ডেকে নিয়ে যায়। যার বর্ণিতরূপ–

বিকলাঙ্গ, পঙ্গু যারা, নষ্টভাগ্য পিতৃমাতৃহীন
কাদায়, জলে, ঝড়ে নড়ে কেবল একসার অসুস্থ স্পন্দন
তাদের শুশ্রূষা তোমরা, তোমাদের মুমূর্ষু স্তন।
(শ.ক, প্রাগুক্ত, আলোকিত গণিকাবৃন্দ, পৃ:৪৭)

তবে কবির মধ্যে শুধুমাত্র নাবাচকতার সংক্রমনই নেই, রয়েছে আত্মজিজ্ঞাসা এবং নেতিচক্র থেকে বেরিয়ে ইতিবাচক বোধে আসার আর্তি। সেকারণে তিনি শালিক, খরগোশ, টিয়ে, হরিণ রূপকল্পে কবিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করেন। *'আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও'* কাব্যে - মূলের প্রতি টান, মৃত্যুচিন্তা, পরবাসীর স্বদেশ ফেরার আকুতি

প্রকাশিত। সেইসাথে আলাপনে তিনি বিচ্ছিন্ন, এলোমেলো ও বিক্ষিপ্ত রূপ প্রকাশ করেন। যা 'একা' ও 'স্বগতোক্তি' কবিতায় প্রকাশিত –

বাতাসে বাতাসে এখন তীব্র শীত/ ভেঙ্গে যায় দেহ /পুরনো বাড়িত ভিত/...
ফোটে অযত্নে, বেড়ে যায় ঋণ /চক্রবৃদ্ধি হারে। (শ.ক, প্রাগুক্ত, একা, পৃ:৪৩)
অথবা,
তোর বান্ধবেরা একে একে /উঠে গেছে...
তল্পিতল্পা গুটিয়ে কোথায় চললি /ফের বল।
(শ.ক, প্রাগুক্ত, স্বগতোক্তি, পৃ:৪২)

স্বাধীনতা পরবর্তী কালের বাংলা কবিতার প্রধান কণ্ঠস্বর শহীদ কাদরী। আজন্ম শহরে লালিত তিনি। তাঁর রচনায় স্বকীয়ভাবে নগরচেতনা এমন এক শুভ্র স্বাভাবিকতায় বিধৃত যা তাঁকে ঈর্ষণীয় একাকিত্বে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে। যা তাঁর কবিতায় অনিবার্যরূপে হয়ে উঠেছে আত্মজৈবনিক ও স্বীকারোক্তিমূলক। যার কারণে ব্যক্তিমানস উন্মোচনে কবি অকপট মনোবিশ্লেষক হয়ে কবিতাকে একইসাথে করে তুলেছে আধুনিক ও আধুনিকোত্তর । যার প্রকাশ-

আমি অনেকদিন পর একজন হা-ঘরে
উদ্বাস্তু হ'য়ে চরকির মতো গোটা শহর ঘুরে বেড়ালাম।
(শ.ক, প্রাগুক্ত, আজ সারাদিন, পৃ:১১৬)

ভালো ও মন্দের দ্বিমাত্রিক উজান ও ভাটির সঙ্গমে কিংবা শুরু ও শেষে এই দোলায় সন্ত্রস্ত শহর ও সুন্দরতম শহরে পরিণত হতে পারে, যা কবির 'উত্তরাধিকার' ও 'অলীক' কবিতায় বর্ণিত হয়েছে। উত্তরাধিকরের বিপরীত চিত্র অলীকে উদ্ধৃত এভাবে–

একটি নর্তকীর নাচ তার অন্তিমে /পৌছানোর আগে দশ লক্ষ কথার ঝনৎকারে
বোঝা যায় আমি আর একা নই/ এই সুন্দরতম শহরে। (শ.ক, প্রাগুক্ত-অলীক, পৃ: ৩৩)

সেই সাথে কবি নগর জীবনকে কেন্দ্র করে মানবীয় যন্ত্রণা ও বিকার গ্রস্ততার পতনগুলোকে উন্মোচন করতে চেয়েছেন এক এক করে। টেলিফোনে আরক্ত প্রস্তাব, উত্তরাধিকার, দুই প্রেক্ষিতে -এইসব কবিতায় শহীদ কাদরীর শহর চেতনা স্বরূপ অনুভব করা যায়। শহীদ কাদরী কিভাবে নাগরিক অভিধায় অভিহিত হয়েছেন তা এখানে তাঁর 'নিসর্গের নুন' কবিতায় প্রকাশিত–

বেঁচে আছি তোমারই অশেষ কৃপায়...
আজীবন নন্দিত রবীন্দ্রনাথ থেকে
শুরু করে তিরিশ ও তিরিশোত্তর অনেকেই।

(শ.ক, প্রাগুক্ত, নিসর্গের নুন, পৃ: ৪১)

নাগরিক চেতনার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শরীরী প্রেমকে সহজ স্বীকার । উদাহরণগুলো থেকে শহীদ কাদরীর কবিতায় এ সহজ স্বীকৃতি পাওয়া যায়– টেলিফোনে আরক্ত প্রস্তাব (১৬) /
কিছুই শোনে না কেউ তলপেটে অনাস্বাদিত কাম (পাশের কামরার প্রেমিক -২৮)
দেখি স্নানরত/একটি নারী নগ্ন (৩৭) /মোহন ক্ষুধা (৩৯)
কাদরীর কাছে প্রেম পায় সর্বত্রই ক্ষণিকের মিলন মাধুরী এবং তা তীব্রভাবে শরীরী। এ ক্ষেত্রে ভাবনাও তাঁকে আকর্ষণ করেছে। প্রেম সম্পর্কে কবি 'প্রজ্ঞা' কবিতায় লিখেছেন–

শুনুন সাহেব! মার্কস অথবা হেগেল নয়/ মেধা বা মণীষা নয় /
সুপ্রতিষ্ঠিত এবং আনন্দঘন / জীবনের মূল
স্বনির্বাচিত মহিলার/ স্তন,উরু এবং উদ্দাম ঘন কালো চুল। (শ.ক, প্রাগুক্ত, প্রজ্ঞা, পৃ:৩৩),

অথবা

তোমার জবার মতো চোখে রাঙা শ্রাবণের জল /
পালতোলা নৌকার মতন বাঁকাচোরা ঢেউয়ে ঢেউয়ে কম্পমান/
তোমার বিপদগ্রস্ত স্তন।/আমি ভাবতে পারিনি কোনদিন এত অসাধারণ আগুন
প্রলয় এবং ধ্বংস রয়েছে তোমার চুম্বনগুলিতে।
(শ.ক, প্রাগুক্ত, আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও, পৃ: ১৭)

নাগরিকতার আরেক বৈশিষ্ট্য হলো- বিপন্ন সভ্যতার আক্রমণে মানুষের অসহায়ত্ব। কাদরীর 'আমি কিছুই কিনব না' কবিতার স্তরে স্তরে এই সত্য প্রকাশিত। এ কবিতায় কবি অনেক নাগরিক সুখ-সুবিধা হাতের নাগালে পেলেও নাগরিক বিচ্ছিন্নতায় ধাবিত মানবমনের অন্তঃসারশূন্য ছবি এঁকেছেন, যা এলিয়টের ফাঁকা ফাঁপা শহরচিত্রের অনুরূপ। তাঁর নাগরিক বোধের একপ্রান্তে যেমন দীপ্র আধুনিকতা অন্যপ্রান্তে তেমনি ক্লান্তি, ক্ষয়িষ্ণুতা, একাকিত্ব এবং অসহায়তার বোদলেয়ার - এলিয়ট বাহিত অনুভবপুঞ্জ। যার বহিপ্রকাশ 'সঙ্গতি' কবিতায় দৃশ্যমান–

'সুপ্রচুর বিমুক্ত হাওয়া কেন তবে কষ্টশ্বাস/ কেন এই স্বদেশ সংলগ্ন আমি নিঃসঙ্গ উদ্বাস্তু
জনতার আলিঙ্গনে অপ্রতিভ অপ্রস্তুত অনাত্মীয়/ আধাঁর টানলে যেন ভূতলবাসীর মতো যেন
সদ্য উঠে আসা কিমাকার বিভীষিকা নিদারুণ।
(শ.ক, প্রাগুক্ত, নপুংসক সন্তের উক্তি-পৃ:১৪)

অথবা

বাঘ কিংবা ভালুকের মতো নয়,/বঙ্গোপসাগর থেকে উঠে আসা হাঙরের দল নয়,...
অস্বীকার করার উপায় নেই ওরা মানুষের মতো/

দেখতে, এবং ওরা মানুষই,/ওরা বাঙলার মানুষ
এর চেয়ে ভয়াবহ কোন কথা আমি আর শুনবো না কোনদিন।
(শ.ক, প্রাগুক্ত-হন্তারকদের প্রতি, পৃ: ২২)

এই বিচ্ছিন্নতাবোধ, এই অন্ধকারাচ্ছন্ন যন্ত্রনাময় অস্তিত্বের অনুভব জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথের ন্যায় শহীদ কাদেরীকেও পীড়িত করেছে। যার ভিন্নসুর 'এই শীতে' কবিতায় প্রকাশিত–

অথচ এ শীতে একা উদ্ধত আমি /আমি শুধু পোহাই না ম্লান রোদ
প্রতিবেশী পুরুষ নারী আর বিশাল/যে রিক্তগাছ সে ঈর্ষায় সুখী
নিয়ত উত্তাপ দিই বাবু পরিজনে /আমি শুধু
(শ.ক, প্রাগুক্ত-এই শীতে, পৃ:৫১)

একাকিত্ব বোধ তাঁকে প্রাঙ্গণের তরুণ কুকুরটি সঙ্গে একাত্ম করে কিন্তু তার চোখেও তিনি দেখেন লক্ষ সূর্যের আসা যাওয়া। শহীদ কাদরী বোদলেয়ারীয় প্রকৃতির প্রতি অনীহার ব্যবহার করে তিনি 'একটি ব্যক্তিগত বিপর্যয়ের জার্নাল' নামে একটি চমৎকার কবিতা লিখেছেন। তাছাড়া নিসর্গের প্রতি বিরূপ ভাবনা-'নপুংসক সন্তের উক্তি, কবিতাই আরাধ্য আমার, 'সময়কালীন জীবন দেবতার প্রতি' এবং 'নিসর্গের নুন' কবিতাগুলিতে ও এই বোধটি তীক্ষ্ণ ও বিদ্রূপে জর্জরিত হয়ে প্রকাশিত–

কেক- পিস্ট্রির মতোন সাজানো থরে থরে নয়নাভিরাম/
পুস্পগুচ্ছের কাছেও গিয়েছি তো ম্লান রেস্তোরাঁর
বিবর্ণ কেবিনে আশ্রয়ের যে আশ্বাস এখনও
টেবিল ও চেয়ারের হিম শূন্যতার লেখা আছে
তেমন সাইবোর্ড কোন জুঁই চামেলী অথবা
চন্দ্রমল্লিকার ঝোপে ঝাড়ে আমি তো খোজেও/ পেলাম না।
(শ.ক, প্রাগুক্ত, নিসর্গের নুন, পৃ:৪১)

একইভাবে শহীদ কাদরীর 'পতন' কবিতায় সুধীন্দ্রিয় ক্ষয়চেতনা প্রবল হয়েছে। এ কবিতার ভাবানুষঙ্গে একাধিক নাগরিক অনুষঙ্গ দেখা যায়। যার ব্যক্তরূপ–

টেবিলের উজ্জ্বল রেডিয়ো একদিন জ্বলে না ডায়াল তার
নিরালোক পড়ে থাকে নিঃসঙ্গ ধুলোর আস্তরণে বহুদিন/...
একে একে খসে পড়ে প্রতি অঙ্গ, ঝলসে যায় ভালভ্
চিকন মসৃন তার, প্রাণবাহী শিরা উপশিরা ছিন্ন হয়
টেরিলিন মহিলার ত্বকের মহিমা

গ্যারেজে বিধ্বস্ত হয় মোটরের মাংসল টায়ার। (শ.ক, প্রাগুক্ত, পতন, পৃ: ৪৯)

শহীদ কাদরীর কবিতায় নগর জীবনের বৈশিষ্ট্য-আত্মকেন্দ্রিকতার চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। যা তাঁর 'যেতে চাই' কবিতায় প্রকাশিত–

আমি তোমাদের দিকে যেতে চাই/ঝকঝকে নতুন একটি সেতু
যেমন নদীর পাড়ে দাঁড়ানো ঐ লোকগুলোর কাছে পৌঁছে যেতে চায়
কিন্তু তামা ও পিতলসহ বাসন-কোসন, চিঁড়ে-গুড় ইত্যাদি গোছাতে
তোমরা ব্যস্ত, বড্ড বেশি ব্যস্ত। (শ.ক, প্রাগুক্ত, যেতে চাই, পৃ: ১১৭)

শহীদ কাদরীর নগর চৈতন্য শামসুর রাহমানের ন্যায় পুরনো শহরের ইতিহাস ঐতিহ্য কিংবদন্তি স্নাত নয়। উচ্চবিত্ত জীবনের উপকরণ বিজড়িত, এই নাগরিকতা নব্য আধুনিক ঝকঝকে। এখানে মোটরের- তেরচা, বেনেট, বৃষ্টি পড়ে, কানিয়াকের বোতল, কড়া সিগারেট, চোখামুখো জুতো, সরু বেল্ট, রুক্ষ চুল, টেরিলিনের শার্ট, নীল চিঠি, সিল্কের স্কার্ফ, উজ্জ্বল রুমাল প্রভৃতি দৃশ্যমান। এখানে বার্মাটিকের নিপুণ পালিশ, সেগুন কাঠের ওয়ার্ডরোব, বারান্দার হাতল চেয়ার টেবিল উজ্জ্বল রেডিও, টেলিফোনের কালো ডায়াল, লন্ড্রির হলুদবিল, বিত্তবান নাগরিক জীবনের স্বাদ বহন করে। এখানে উঠে আসে ম্যানসন গাড়ির বারান্দা, রেস্তোরাঁ কেবিন এবং সেই সঙ্গে শহুরে মানুষের জীবন জটিলতার আবেগবৃত্তি। হতাশা, ক্রন্দন, আতঙ্ক, ক্রোধ, অক্ষমতা, অনিশ্চয়তা, শূন্যতা। পৃথিবীর বড় বড় সার্বজনীন সিটিগুলোর তুলনায় ঢাকা একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম হিসাবের জীবনানুভব - তিনি সততার সঙ্গে কাব্যজাত করেছেন। তিনি শহরের মানুষের অস্তিত্বের স্বরুপ আত্মজৈবনিক দৃষ্টিতে তাঁর অভিজ্ঞতা মেধা ও মনন দিয়ে উন্মোচন করতে চেয়েছেন। যার প্রকাশিত রূপ–

সূর্যের জ্বলজ্বলে আরক পান করেছিল নাকি/মাতৃজরায়ন, আমার মাংসে যার
বিচ্ছুরিত তাপ! হরিদ্রাভ আকাশের ওষ্ঠে জমে ওঠা
আমি কি হঠাৎ কোন পথভ্রষ্ট চুন?/দৈবাৎ বিক্ষিপ্ত এই বিশ্বলোকে/মুহ্যমান নগরশীর্ষে
লুটিয়ে পড়া এক নির্বাসিত কেতন/অথবা শূন্যতার সৌরগলার নক্ষত্রোচ্ছল বমন? (শ.ক, প্রাগুক্ত, জন্মবৃত্তান্ত , পৃ: ৫৬)

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : জীবনরূপায়ণ

জীবনকে নান্দনিকরূপে প্রকাশই হলো সাহিত্য। আর জীবন হলো সমস্ত বৈরীভাব তথা পতনের মধ্যে এক মুহূর্তের জাগরণ বা উত্থান। এই জীবন রূপায়ণের ধারায় চর্যাপদ থেকে আজ অবধি কতশত কবিতা লেখা হয়েছে, তার হিসাব আমাদের কাছে গৌণ। অর্থাৎ কাল পরম্পরায় 'কবিতার ইতিহাস' রচিত হয়েছে জাগরিত সত্যের চর্চার সমন্বয়ে। আমরা প্রতিনিয়ত অনুরুদ্ধ বা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অবারিত ধারায় লিখে যাচ্ছি। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাচর্যবিনিশ্চয়তেও বর্ণিত হয়েছে বাঙালীর প্রতিদিনের ধূলি মলিন জীবনচিত্র। সুখদুঃখ, হাসিকান্নার টুকরো টুকরো রেখাচিত্র। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের অন্যতম নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও বর্ণিত হয়েছে রাধা কৃষ্ণের কথার আড়ালে ঈশ্বরের প্রতি জীবকূলের আকুলতার ছবি। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগীয় আবহ থেকে বাংলা কবিতার মুক্তি ঘটান রেঁনেসাসীয় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনিও জীবনরূপায়ণে বহুমাত্রিক রূপান্তর ঘটান। এরপর রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, ত্রিরিশের দশকে কবিরা বাংলা সাহিত্যের ধারায় নবরূপের জাগরণ ঘটান। মূলত ত্রিশের দশকে পাশ্চাত্য প্রভাবিত আধুনিকতার উন্মেষ ঘটে বাংলা কবিতায়। (বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত- অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,পৃ: ১৪-১৬) আর এরই বিস্তৃতি দেখা যায় চল্লিশ, পঞ্চাশ কিংবা ষাটের দশকে। পঞ্চাশ উত্তর বাংলা কবিতায় আধুনিক মননের ছাপ এবং জীবনবোধ সংযোগ ঘটিয়ে কবিতার উৎকর্ষ সাধনে যারা নিমগ্ন ছিলেন তাদের মধ্যে শহীদ কাদরী ছিলেন অন্যতম। সাহিত্য আদেশ-উপদেশ পালনের চেয়ে জীবন ঘনিষ্টতার সঙ্গেই সম্পর্ক খোঁজে। জীবন বন্দনার জন্যে শহীদ কাদরী কোনো প্রচলিত মতবাদের সস্তা সরলতায় সমর্পিত হননি, বরং সাত্ত্বিক কবি সময়ের ভাঙচুরকে শিরোধার্য করে বারবার নিজেকে নবায়ন করে নিয়েছেন। সেই সাথে মেনে নিতে কুণ্ঠিত হননি তাঁর আরাধ্য মানুষ, সমাজ, ভালোবাসা এবং পরবাসকে। জীবন ও সমাজের নানা মাত্রিক স্তরকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ করার নিরন্তর প্রচেষ্টা তাঁর কবিতার পঙক্তিতে অনিবার্য হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ কবি আপন জীবন তথা আত্মজৈবনিক উপাদানকেই তাঁর সৃষ্টিকর্মের সর্বোৎকৃষ্ট উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যা তাঁর 'একটি উত্থান পতনের গল্প' কবিতায় প্রকাশিত–

আমার বাবা প্রথমে ছিলেন একজন/শিক্ষিত সংস্কৃতিবান সম্পাদক/
তারপর হলেন এক/ জাঁদরেল অফিসাঁর;
তিনি স্বপ্নের ভেতর/ টাকা নিয়ে লোফালুফি খেলতেন
টাকা নিয়ে/ আমি তাঁর ছেলে। আমি স্বপ্নের ভেতর
নক্ষত্র নিয়ে লোফালুফি করি/নক্ষত্র নিয়ে;...
বাবার নাম খালেদ ইবনে- আহমদ কাদরী
যেন দামেস্কে তৈরী কারুকাজ করা একটি বিশাল ভারী তরবারী...

আমার নাম শহীদ কাদরী /ছোটো, বেঁটে-ঝোড়ো নদীতে/
কাগজের নৌকোর মতোই পল্‌কা/ কাগজের নৌকোর মতোই পল্‌কা।
(শ.ক, প্রাগুক্ত, একটি উত্থান পতনের গল্প, পৃ:১৬৮)

আড্ডাপ্রিয় শহীদ কাদরী জীবনকে সহজিয়াভঙ্গিতে দেখেছেন। তিনি নজরুলের মতই বাউন্ডলে ও যাযাবর জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। যা কবির *'উত্তরাধিকার'* কাব্যের কবিতা 'অগ্রজের উত্তরে' প্রকাশিত। এ কবিতায় কবি ভবঘুরে জীবন যাপনের মাধ্যমে বন্ধনহীন মুক্তির কথা আত্মজৈবনিক করে প্রকাশ করেছেন। যার কাব্যরূপ

না, শহীদ সে তো নেই, গোধূলিতে তাকে
কখনও বাসায় কেউ কোনদিন পায়নি, পাবে না।...
না, না, তার কথা আর নয়, সেই
বেরিয়েছে সকাল বেলায় সে তো শহীদ কাদরী বাড়ি নেই।
(শ.ক, প্রাগুক্ত, অগ্রজের উত্তর-৬২ পৃ:)

শহীদ কাদরী নগরচেতনাকে গ্রামীণ প্রকৃতিময়তায় একান্ত করে জীবনরূপায়ণে চিত্রিত করেছেন। জীবনকে তিনি প্রকৃতির বাস্তবতার নিরিখে প্রকাশ করেছেন। 'এবার আমি' কবিতায় কবি নাগরিক মানুষকে গ্রাম থেকে ট্রেন ভর্তি শিউলি ফুল তথা প্রকৃতির সাহচার্যে আত্মিক মানুষ হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। একইসাথে এ কবিতায় কবি যান্ত্রিক জীবনের ছবি উপস্থাপনের পাশাপাশি প্রকৃতির কাছে মিশে যাবার ইচ্ছাকে ধারণ করেছেন। যার কাব্যরূপ–

আমি করাত কলের শব্দ শুনে মানুষ
আমি জুতোর ভেতর, মোজার ভেতর সেঁধিয়ে যাওয়া মানুষ
আমি এবার গাঁও-গেরামে গিয়ে
যদি ট্রেন ভর্তি শিউলি নিয়ে ফিরি
হে লোহা, তামা, পিতল এবং পাথর
তোমরা আমায় চিনতে পারবে। তো হে।
(শ.ক, প্রাগুক্ত, এবার আমি, পৃ: ১৪৪)

কবি 'এবার আমি' কবিতা ছাড়াও 'এই শীতে' কবিতায়ও মানব মনের সাথে প্রকৃতির স্বভাব বৈশিষ্ট্যের মেলবন্ধন ঘটান। যা উপস্থাপিত হয়েছে এভাবে–

শীতার্ত নিঃস্বতায় কিছুই বাঁচে না যেন / বেঁচে থাকা ছাড়া, বসন্তের শিথিল স্তন
নিঃশেষে পান করে নিঃস্বার্থ মাটি/ লতা-গুল্ম গাছ কাক শালিক চড়ুই

এমন কি অসহায় গর্তের দেয়ালের জীব...

(শ.ক, প্রাগুক্ত, এই শীতে, পৃ: ৫১)

শহীদ কাদরী জীবনকে গভীর বোধের জায়গা থেকে উপলব্ধি করেছেন। প্রকৃতির প্রতিটি বিষয়ই যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মিথষ্ক্রিয়ায় আপন গতিতে আবর্তিত হয়, তার ছবিও তিনি এঁকেছেন তার 'সেলুনে যাওয়ার আগে' কবিতায়। সময় ও নদীর স্রোত যেমন আপন ধারায় প্রবহমান, ঠিক তেমনি সৃষ্টিজগতের সকল প্রকৃতিই যে তার নিজেস্ব গতিতে অগ্রসর হবে তা ব্যক্ত হয়েছে এ কবিতায়। আর এ প্রকৃতির গতি রোধ করতে গেলেই তা হবে গতিহীন আহত ঘোড়ার মত। অর্থাৎ কবি এ কবিতায় বাধা না মানা বেড়ে ওঠা চুলের মধ্য দিয়ে '৭১ এর অপ্রতিরোধ্য মুক্তিবাহিনীর প্রতিবাদের চিত্রকেই তুলে এনেছেন। যার কাব্যিক উপস্থাপন নিম্নরূপ–

আমার চুল যে তবু আমার অধীনে নয়,
নিজেই যে বেড়ে ওঠে। নড়ে-চড়ে
কর্কশ কাকের মতো.../ ট্রাফিক সিগন্যালের মতো নরসুন্দরের
সবল সচল কাঁচি/সহসা থামাবে তার
বিশৃঙ্খল গতিবিধি, দৌড় ঝাপ, লাফালাফি!...
মূক ও বধির চুল মাস না যেতেই
আহত অশ্বের মতো আবার লাফিয়ে উঠেছে অবিরাম।

(শ.ক, প্রাগুক্ত, সেলুনে যাওয়ার আগে, পৃ: ৬৭)

শহীদ কাদরী ঋণ স্বীকারের মধ্য দিয়ে জীবনকে অনেক বেশি ইতিবাচকতায় দেখেছেন, যা তাঁর 'টাকাগুলো কবে পাবো' কবিতার লক্ষ্যণীয়। এ কবিতায় কবি প্রাচ্য সাহিত্যের কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথসহ পাশ্চাত্য কবি শার্ল বোদলেয়ার ও রিল্কে প্রমুখের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। যা মূলত সংবেদনশীল কবির বিনয়ী জীবনাচারের দৃষ্টান্ত। যার কাব্যরূপ–

পার্কের নিঃসঙ্গ বেঞ্চ/ রাতের টেবিল আর রাজনীগন্ধার মতো কিছু
শুভ্র সিগারেট ছাড়া/কেউ কোনো জানবে না ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক এক
আমারও রয়েছে। রবীন্দ্র রচনাবলী নামক বিশাল
বানিজ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ আমিও রেখেছি।
তাছাড়া জীবনানন্দ দাশ ও সুধীন্দ্রনাথসহ...
একবার শার্ল বোদলেয়ার প্রেরিত এক পিপে সুরা আমি
পেয়েছিলাম কৈশোরে পা রেখে, ...
রিল্কে পাঠিয়েছিলেন কিছু শিল্পিত গোলাপ

(একজন প্রেমিকের কাছে আমি বিক্রি করেছি নির্ভয়ে)
এজরা পাউন্ড দিয়েছিলেন অনেক ডলার/রাশি রাশি থলে ভরা অসংখ্য ডলার
(ডলার দিয়ে কিনেছি রাতের আকাশ)/এবং একটি গ্রীক মুদ্রা
(সে গ্রীক মুদ্রাটি সেই রাতের আকাশে নিয়মিত জ্বলজ্বল করে)
(শ.ক, প্রাগুক্ত, টাকাগুলো কবে পাবো?, পৃ: ১০৪)

শহীদ কাদরীর 'সঙ্গতি' কবিতায়ও জীবনঘনিষ্ঠ উপলব্ধি স্পষ্ঠভাবে প্রকাশিত। যেখানে সব অন্বেষণের শোভন সমাপ্তির পরও অতৃপ্ত আত্মা ফিরে ফিরে চলে আসে। বস্তুত অন্বেষণই জীবনকে বদলে দেয়। আর তাদের প্রাপ্তি এবং গন্তব্যকে নির্ধারণ করে, সেই কারণেই কবিতায় জয়সূচক উক্তি হয়ে উঠেছে 'কালো রাতগুলো বৃষ্টিতে হবে সাদা' আর তাই বারবার এই ধ্রবা'র পুনরাবৃত্তি ঘটে। উদাহরণস্বরূপ–

বন্য শুকর খুজে পাবে প্রিয় কাদা/মাছরাঙা পাবে অন্বেষণের মাছ,
ঘন জঙ্গলে ময়ূর দেখাবে নাচ.../ প্রেমিক মিলবে প্রেমিকার সাথে ঠিক-ই
কিন্তু শান্তি পাবে না। পাবে না, পাবে না...।(শ.ক, প্রাগুক্ত, সঙ্গতি, পৃ: ১২০)

এটা একালের লিরিক। এ লিরিক আধুনিক জীবনের রূপ মেনেই পুনর্বাসিত হয় আমাদের জীবন ও কবিতায়, শুধু অন্ধ বধিরের মতো ছন্দ মিলের প্রাচীনতার পুনবার্তনে তার মুক্তি নেই। সাহিত্য আমাদের জীবনের মতোই পিছু ফেরে না। কেবল ক্রমাগত সামনের দিকে এগিয়ে যায়, পিছনের আসবাবপত্র ব্যবহার করে নতুন সংসার পাতে। তাই কাদরীর 'সঙ্গতি' কবিতাটি স্পষ্টত অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার অন্তঃসারশূন্য প্রতিবাদ নয়, কেবল অন্তঃসারপূর্ণ নতুন অন্তরাখ্যান। কাদরী যে জীবনের জয়মিনার তুলে ধরেছেন তা টিয়ে পাখির পালক আর গোলাপের পাপড়ি দিয়ে তৈরী এক নিশানের মতো স্বাভাবিক সুন্দরের জলে স্নাত সত্যের মূর্তির মতো প্রতিবিম্বিত হয়। (শালুক, প্রাগুক্ত, পৃ:-১২৩)

জীবন বন্দনায় শহীদ কাদরী পরিণত মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ ঘটান। তিনি জীবনের প্রাত্যহিক সরল অভ্যস্ততার 'জীবনছবি' মুদ্রিত করেন গভীর অনুভবে, যা তাঁর 'কোনো কোনো সকালবেলায়' কবিতায় প্রকাশিত। এ কবিতায় কবি যুদ্ধকালীন জীবনের সঙ্কটকে প্রাত্যহিক প্রকৃতি, মলত্যাগ কিংবা মূত্রত্যাগের মতই সহজাত করে তুলে এনেছেন তাঁর কবিতায়–

যুদ্ধ, হত্যা, মারী, মড়ক, টুথব্যাশ, মাজন এরা সব
জীবনের জটিল কল্লোল হয়ে উঠে
মলত্যাগ, মূত্রত্যাগের মতো অকথ্য, উচ্চারণের অযোগ্য ব্যাপারগুলো
জয়গানের মতো মনে হয়,

নিজের মনুষ্যজন্মের জন্যে আর মনস্তাপ থাকে না।

কোনো কোনো সকালবেলা।

(শ.ক, প্রাগুক্ত-কোনো কোনো সকালবেলা, পৃ: ১৪৯)

কবি জীবনের নিগুঢ় বাস্তবতাকে জটিল চারপাশের আবহে আত্মজৈবনিক চিন্তনে প্রকাশ করেছেন। যা 'আমি নই' কবিতায় তাঁর আত্মতার রণ-নিনাদ, হয়ে 'অন্যরকমভাবে উচ্চারিত–

আমি নই কারো নিতম্বশোভা, বৈঠকখানা, চেয়ার, /আসবাব নই দামী,

করতলগত পাথর খণ্ড ছুঁড়ে দিলে কোনো পুকুরে

উচু হয়ে পড়ে থাকবই আমি ভালো মানুষের মতো? ...

তার মানে, জেনো নুলো-ঠুটোদের মতে

ঝরাপাতাদের ইয়ার দোস্ত নই আমি–

বৃক্ষলতার শান্ত, শীতল অনুজ। (শ.ক, প্রাগুক্ত, আমি নই, পৃ:১৩০).

কবি 'কোনো ক্রন্দন তৈরী হয় না' কবিতায়ও - মৃত্যুর অধিক জীবনের জয়গান গেয়েছেন। এ কবিতায় জীবনের রাত, উঠানে অবসিত মাছের আঁশ জোছনার মতো হেলায় ফেলায় পড়ে থাকে। বসন্তের হাওয়া নিরন্ধ্র কবরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে। অর্থাৎ নিরাক-নিরাশাকরোজ্জ্বল যে জীবন - প্রায় মৃত, প্রায় কবর সমাহিত, তাকেও যে বসন্তের বাতাস জীবনের জন্যে আকুল করে তারই নির্ঝর-নিটল বুনন এ কবিতায় বর্তমান।

একটি মাছের অবসান ঘটে চিকন বটিতে

রাত্রি উঠোনে তার আঁশ জ্যোৎস্নার মতো

হেলায়-ফেলায় পড়ে থাকে/কোথাও কোনো ক্রন্দন তৈরী হয় না।

কবরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে প্রথম বসন্তের হাওয়া

মৃতের চোখের কোটরের মধ্যে লাল ঠোঁট নিঃশব্দে ডুবিয়ে বসে আছে।

একটি সবুজ টিয়ে,

(শ.ক, প্রাগুক্ত, কোনো ক্রন্দন তৈরী হয় না, পৃ: ১৩৬)

শহীদ কাদরীর কবিতার উচ্চারণ হৃদয়স্পর্শী এবং যুক্তিপূর্ণ বলে তাঁর কবিতায় স্থাপত্যের সৌন্দর্য্য স্বভাবতই প্রকাশিত। 'চাই দীর্ঘ পরমায়ু' কবিতায়ও দেখি : যুদ্ধ হত্যা মারী মড়ক তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনি ধ্বংসের মাঝে সৃষ্টিকে দেখে পরিতৃপ্ত হতে চান। ফলে শহীদ কাদরী জীবনের সুখ-দুঃখের পালা বদলে বিশ্বাসী হয়ে জীবনে জয়ের নিশান উড়াতে চেয়েছেন।

'কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই' কাব্যগ্রন্থে বেশকিছু কবিতায় জীবন জয়ের উদীপ্ত কথা উঠে এসেছে। যার 'আরক্তিম হীরকগুচ্ছ' নিম্নে উল্লেখ করা হল–

১) ঐ বালকেরা বিশ্বাস করে মহাবিস্ফোরণের পরও
ওদের লাল, নীল, সবুজ মার্বেলগুলো
পরীদের চোখের মতো অখন্ড অটুট থেকে যাবে। [বালকেরা শুধু জানে –ঐ]

২) আমি কি দেখি নাই ঘর্ণাবর্তে
হঠাৎ ছিঁড়ে পড়া পালকগুচ্ছ
টিয়ার ঝাঁকগুলো কাদায়, গর্তে
বাতাস বহে যাও শীতের বাতাস [শীতের বাতাস- ঐ]

৩) তাদের জীবন তবু আমার মতোন, জানি,
একটি শহরে কিংবা কয়েকটি রেস্তোরাঁয়
কখনো সমাপ্ত নয়। [মৎস্য - বিষয়ক ঐ]

৪) দাঁড়াও, আমি আসছি/তোমাকে চাই ভাসতে ভাসতে
ডুবতে ডুবতে/ডুবে যেতে যেতে আমার
তোমাকে চাই/দাঁড়াও। আমি আসছি... [দাঁড়াও, আমি আসছি -ঐ]

জীবনোদ্দীপক কবিতা রচনায় শহীদ কাদরী সুধীনদত্তের মত কম লিখলেও মহাকালে কড়া নেড়েছেন এবং মহাকালের সীমায় চিরস্মরণীয় হয়ে উঠেছেন। তিনি জীবনোপলব্ধিতে বিদেশ মানেই নির্বাসনকে বোঝেছেন। আর বিদেশ মানেই মৃত্যুসম বেঁচে থাকার সামিল বলেছেন। যা তাঁর 'কোন নির্বাসনই কাম্য নয় আর ' কবিতায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে–

কোন নির্বাসনই কাম্য নয় আর
ব্যক্তিগত গ্রাম থেকে অনাত্মীয় শহরে
পুকুরের যৌথ স্নান থেকে নিঃসঙ্গ বাথরুমে...
কাম্য নয় আপন ভদ্রাসন থেকে ভাড়াটে ফ্লাটে
এই স্বাদু শোল মাছের ঝোল থেকে
স্বাদমুক্ত চিকেন সুপ/আর ডিনার রোলে
না, কোনো নির্বাসনই কাম্য নয় আর।

(শ.ক, প্রাগুক্ত, কোনো নির্বাসনই কাম্য নয় আর, পৃ: ৩৭)

আমৃত্যু শহীদ কাদরী বেঁচে থাকার ইচ্ছা পোষণ করেছেন অপরিমেয় জীবনাকাঙ্ক্ষার চেতনায়। যা তাঁর 'অটোগ্রাফ দেওয়ার আগে' কবিতায় প্রকাশিত–

সর্বত্র এবং যত্রতত্র লিখেছি আমার নাম
বন্ধুর গ্রামের ভিটায়, পরিত্যক্ত রিক্ত কোনো
হানাবাড়ির সাঁতলা - পড়া পুরনো ইটায়, বাইজিদ বোস্তামীর প্রাচীন ঘাটলায়।...

নিদারুণ যত্নে বড়ো বড়ো অবিচল হস্তাক্ষরে/ লিখেছি আমার নাম।

(শ.ক, প্রাগুক্ত, অটোগ্রাফ দেওয়ার আগে, পৃ: ১৩১)

শহীদ কাদরী স্থবির পাথরের মধ্যেও দেখতে পান গতিময় জীবন তথা নাচের ছন্দাবর্তন। যা 'নর্তক' কবিতায় প্রকাশিত। অকাল প্রয়াত তরুণ কবি আবুল হাসান নিজেকে একটি কবিতায় পাথররূপে প্রতিষ্ঠা করলে শহীদ কাদরী তার প্রতিবাদ করে লিখেন– 'আবুল হাসান একটি উদ্ভিদের নাম' কবিতাটি। যেখানে কবি বলেছেন– আসলে আবুল হাসান এক তরু, পাথরখন্ড চাপা পরিত্রাণকামী সজল উদ্ভিদ। যা কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে এভাবে–

এ শহরে, দীর্ঘ পরবাসে / অবশেষে নিজেকে পাথর বলে
একদিন চিহ্নিত করেছো বেদনায়
খুব অল্প বয়সেই জানি। আমি কিন্তু এখনও যে, কোনো
পাথর খন্ড-চাপা পরিত্রাণকামী সজল উদ্ভিদ দেখে বলি:
'আবুল হাসান, একই শীত-হাওয়া বয় আমাদেরও/ চিবুকে ও চুলে'।
(শ.ক, প্রাগুক্ত, আবুল হাসান একটি উদ্ভিদের নাম, পৃ: ১৩৭)

অর্থাৎ জীবনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি কবি শহীদ কাদরীকে অধিক প্রত্যয়ী করে তুলেছিল। যে কারণে তিনি প্রাণহীন জড়পদার্থের ভেতরেও আশ্চার্য প্রাণের স্পন্দন খুঁজে পেয়েছেন– তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতায়ও মৃত্যুর অধিক যে জীবনের উজ্জ্বল রক্তিম পতাকা তা প্রকাশিত। এছাড়া আরও বেশ কিছু কবিতায়ও এই জীবনের জয়ধ্বনি প্রকাশিত হয়েছে–

জরায়ুতে তার দারুণ বন্য বেগে/কালো রাত্রির সফেদ অশ্বারোহী
নেচে ওঠে বেনো তাল-মান-ছেঁড়া লয়ে/এই দ্যাখো ফের উজ্জ্বল উত্থান।
(শ.ক, প্রাগুক্ত, জীবনের দিকে, পৃ: ১৫৮)

শহীদ কাদরীর বেড়ে ওঠার সময়কালের বাঁকা চিত্র তিনি জীবনবোধের আলোকে বিভিন্ন কবিতায় তুলে এনেছেন। যা দৃষ্টান্তরূপে নিচে উল্লেখ করা হল–

(ক) একবার পেয়েছিলাম দূর বাল্যকালে, কৈশোরে
রাস্তার ফাটলে কিছু তরল জ্যোৎস্না –
সেই থেকে সমস্ত যৌবন অবধি, এমন কি গত যুদ্ধে,
ব্লাক-আউটের ট্রেঞ্চেও, সন্ত্রস্ত স্মৃতির ভেতরে ছিলো...
ভাঙা গলায়, শীত রাত্রে 'জ্যোৎস্না জ্যোৎস্না 'ব'লে বারান্দায় দাঁড়ালে
হুইসিল বাজিয়ে দৌড়ে আসবে পুলিশ, গর্জাবে খাকি জিপ! (২/২৯-একবার দূর বাল্যকালে,পৃ:১০৮)

(খ) আর আমি অপরিসর শয্যার চৌদিকে/অস্তিত্বের সীমা টেনে
দীর্ঘশ্বাসের কালোফুলে সাজাবো স্মৃতির বাসর
নিঃসঙ্গতাকে যৌবনের পরম সুহৃদ জেনে
তার সহোদরা কান্নার বাহুবন্ধে সঁপে দেবো
স্বপ্নের সত্য আর সত্তার সার। (১/১১-জানালা থেকে,পৃ:২৬)

(গ) গান কিংবা সঙ্গীত আসলে একটি অনুভব...
আমার ঘর রেকর্ড প্লেয়ারহীন বটে, কিন্তু আমার অস্তিত্ব
গান শূন্য নয়; কেবল লতায় আর গুল্মে-ঠাসা।/এবং এও সঙ্গীত
(৩/৩০-এও সঙ্গীত পৃ: ১৬০)

(ঘ) আমার পিতা এই গ্রহের অরণ্যে একদীর্ঘ দেবদারু
আমার মা কোনো এক উঠে যাওয়া বাগানের/
শান্ত চন্দ্রমল্লিকা।
(৪/৯-কক্সবাজারে এক সন্ধ্যায় ,পৃ:২৪)

(ঙ) জীবনকে শ্বাপদসংকুল করে তুলেছো–
এবং আমার প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর
তোমাদের তাক করা বন্দুকের নল।

(চ) ঝোপে ঝাড়ে সরীসৃপের মতন বুকে
নিরাপদ নিভৃত কুটির খুঁজতে হয়েছে আমাকে–
তাই এ দীর্ঘ পরবাস। (৪/১০-তাই এ দীর্ঘ প্রবাস ,পৃ:২৫)

(জ) গায়ক পক্ষীরাও নিহত হবে শখের শিকারির
অমোঘ নিশানায়/ইতিহাসও নিরুত্তর। কেন নৃপতিরা
সমাজ্য বিস্তার করেন।/...
যুদ্ধফেরত স্বাধীনতার
ক্রাচে ভর দেয়া সৈনিকেরা লাফিয়ে লাফিয়ে
ফড়িংটাকে হাঁটতে দেখে/ সোল্লাসেতালি/বাজাবে
(৫/১৯- উত্তর নেই ,পৃ: ৪০)

শহীদ কাদরী অনিঃশেষ জীবনাকাঙ্ক্ষা ধারণ করার সাথে সাথে সমাজের আপাঙ্তেয় জীবনচিত্রকে ইতিবাচকতার অনন্য সৌকমার্যে উন্নীত করেছেন। যা তাঁর 'আলোকিত গণিকাবৃন্দ' কবিতায় জীবনের নেতিবাচকতাকে পরিহার করে জীবনকে পুষ্পসম সুখবোধে তুলে ধরেছেন –

শহরের ভেতরে কোথাও হে রুগ্ন গোলাপদল
শীতল, কালো ময়লা সৌরভের প্রিয়তমা

অস্পৃশ্য বাগানের ভাঙাচোরা অনিদ্র চোখের
বিকলাঙ্গ, পঙ্গু যারা, নষ্টভাগ্য পিতৃমাতৃহীন,
কাদায়, জলে, ঝড়ে নড়ে কেবল একসার অসুস্থ স্পন্দন
তাদের শুশ্রূষা তোমরা, তোমাদের মুমূর্ষু স্তন।...
ভ্রাম্যমাণেরে ফিরিয়ে দিলে ঘরের আঘ্রাণ,
তোমাদের স্তব সকল মূল্যবোধ যেন ম্লান।
(শ.ক, প্রাগুক্ত, আলোকিত গণিকাবৃন্দ, পৃ: ৪৭)

একই সুরের ব্যঞ্জনা তাঁর 'নর্তকী' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। এ কবিতায় কবি নর্তকীর প্রতি সমাজের প্রচলিত ধারণা ভেঙে দিয়ে পাখি, ফুল, চাঁদ ইত্যাদি শুভ, সুন্দরের প্রতীকে স্বর্গের ডাইনী নামে অভিহিত করেছেন। যা তাঁর কাব্যরূপে প্রকাশিত–

যেন নীলাভ শিখার মত নির্ভার–
চপল ডানায় হওয়া লাগা দিগন্তলীন কোন পাখি
শূন্যতা গেঁথে নেয় নানান বিন্যাসে...
অর্থহীনতার পরপারে, দুইটি নৈর্ব্যক্তিক নূপুরে
প্রত্যেক চরণঘাতে মুহূর্ত জ্বলে ওঠে গোলাপপুঞ্জের মত,
যার মারত্মক দ্যুতি পান করে নিঃসঙ্গ আত্মালোটায়
অস্তিত্বের অন্তহীনতায়।...
তরোয়ালের মত কিংবা, তীক্ষ্ণ ধারালো চাঁদের মত
চোখের আঁধারে ঐ স্বর্গের ডাইনী যেন গতির পুলকে
তীব্র জ্যোৎস্না হেনে যায়
কী তীব্র জ্যোৎস্না হেনে যায়।
(শ.ক, প্রাগুক্ত, নর্তকী, পৃ: ৫৭)

শহীদ কাদরী, জীবনের বহুমাত্রিক প্রান্তকে স্পর্শ করে তাঁর নিজস্ব জীবন ও পাঠ অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে কবিতা রচনার করে অনন্যতা ধারণ করেছেন। তিনি সুধীন্দ্রীয় অনুশাসনকে চ্যাঙদোলা দিয়ে ব্যক্তিগত জীবনাচারের হাসি-মস্করা, ইৎরামি-ফাজলামি করার ঢঙে নির্মাণ করেছেন 'চন্দ্রাহত সাঙাৎ' কবিতার শরীর, যা তাঁর জীবনবীক্ষারই নিগূঢ় নির্যাস–

দ্যাখো, দ্যাখো, দ্যাখো হে সাঙাৎ
কী ইৎরামি জানে অই চাঁদ...
ত্রি ভুবনে কে কোথায় ধরাপড়ে যায় তার নেই ঠিকঠাক্
নোংরা জলে ভেসে এলে যেন পাতিহাঁস

আন্ধা যে সে বান্ধা পড়ে যায় এমন হঠাৎ

কোকিলও মাঝে মাঝে বনে যায় কাক

মালিক স্বয়ং সত্য করে দেন ফাঁস/

অতএব জান্‌তে যদি পারে জ্যান্ত ধীমান বেবাক/চন্দ্রমাই আমার সাঙাৎ!

(শ.ক, প্রাগুক্ত, চন্দ্রাহত সাঙাৎ, পৃ:৬০).

তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ *'কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই'* তে মৃত্যুর উর্ধ্বে অবিরাম উড়ছে জীবনের উজ্জ্বল রক্তিম পতাকা তথা জীবন জয়ের গান। আর তাই সৃষ্টিক্ষম কবি তাঁর কবিতায় বোধের পরিপক্বতায় জীবনের নানাপ্রান্তিক চিত্রকে বাঙময় করে তুলেছেন তাঁর বোধ, বুদ্ধি, মেধা ও মননের নিটোল বুননে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : দার্শনিকতা

শহীদ কাদরীর কবিতায় জীবনকে দেখার নানাপ্রন্তিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। আর এ জীবনকে দেখবার এ মতাদর্শই হলো তার দার্শনিকতা। এবার আমরা জেনে আসি দার্শনিকতা আসলে কী? দর্শন শব্দটি মূলত সংস্কৃত শব্দ। দৃশ ধাতু এবং 'অনট' সংস্কৃত প্রত্যয়যোগে শব্দটির উৎপত্তি। দর্শন বলতে চাক্ষুস প্রত্যক্ষণকে বুঝালেও দর্শন শুধু চাক্ষুস প্রত্যক্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দর্শন মানে তত্ত্ব দর্শন, জগৎ ও জীবনের স্বরুপ উপলব্ধি। সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বা তত্ত্ব সাক্ষাতকারই দর্শন। দর্শনের ইংরেজি প্রতিশব্দ Philosophy. শব্দটি গ্রিক শব্দ Philos এবং Sophia থেকে উদ্ভূত হয়েছে। Philos শব্দের ইংরেজি অর্থ Loving এবং বাংলা মানে অনুরাগ। Sopia শব্দের ইংরেজি অর্থ Knowledge on wisdom অর্থাৎ যার বাংলা মানে জ্ঞান বা প্রজ্ঞা। কাজেই philosophy শব্দের ধাতুগত অর্থ হলো জ্ঞান বা প্রজ্ঞার প্রতি অনুরাগ। অর্থাৎ দর্শন হলো মানব দেহের ভিতরের হাড়- যা মানুষকে জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য মঁতেইগ যিনি ' পারসোনাল এসেস 'এর প্রবক্তা ছিলেন। তিনি বলেন –

> দার্শনিকতা করার মানে হচ্ছে মৃত্যুকে কীভাবে আয়ত্ত করা যায় সেটা শিখে নেওয়া। এক্ষেত্রে এলিয়টের কথা গ্রহণযোগ্যতা রাখে 'প্রত্যেক কবি, প্রত্যেক মানুষ থেকে বয়সে বিলম্বিত, অনেক বড়।
>
> (শালুক, সাহিত্য ও চিন্তা শিল্পের ছোট পত্রিকা, বর্ষ ১৮ ,সংখ্যা ২১,২০১৬-পৃ:৫৭)

_অর্থাৎ সৃষ্টিক্ষম প্রজ্ঞা তথা কবি শহীদ কাদরীর দার্শনিক চেতনা-প্রজ্ঞা, সমাজ, দেশকাল প্রেক্ষাপট ও জীবনাকাঙ্ক্ষার সূত্রেই নির্মিত হয়েছে। তথা তাঁর দর্শনচেতনায় মূলত তিরিশবাহিত বাংলা কবিতা, পাশ্চাত্য তথা বোদলেয়ার ও এলিয়টের কাব্যপাঠ্যের সূত্র এবং ইঙ্গ মার্কিন কবিতার সমকালীন প্রবাহও লক্ষ্যণীয়। সেইসাথে তাঁর কবিতায় নাগরিক অবক্ষয়, অস্তিত্ব সঙ্কট ও একধরণের নৈঃসঙ্গ্যবোধ ও লক্ষ্য করা যায়। বোদলেয়ারীয় ক্লেদ পঙ্কিলতায় আত্মনিমজ্জনের সূত্রেই নগর যন্ত্রণায় ভূমিষ্ট পাপ সন্তানের মধ্যে নিয়মিত অবধারিত বিধান হিসেবেই তাঁর দর্শনচেতনার মনোবীজটি তৈরি হয়। (বায়তুল্লাহ্ কাদরী-প্রগুক্ত-পৃ:৫৫) যা তাঁর স্বীকারোক্তিমূলক কবিতায় প্রকাশিত

> জন্মেই কুঁকড়ে গেছি মাতৃজরায়ন থেকে নেমে–
> সোনালি পিচ্ছিল পেট আমাকে উগরে দিলো যেনো
> দীপহীন ল্যাম্প্পোস্টের নীচে, সন্ত্রস্ত শহরে
> নিমজ্জিত সব কিছু রুদ্ধচক্ষু সেই ব্লাক- আউট আঁধারে,
> কাঁটা-তারে ঘেরা পার্ক, তাবু কুচকাওয়াজ সারিবদ্ধ...

গাছপালা ঘরবাড়ি ইত্যাদি বদলে গেছে রাঙা রণাঙ্গনে। (শ.ক, প্রাগুক্ত, উত্তরাধিকার, পৃ:২২)

শহীদ কাদরী তাঁর সময়ের মানবিক ও মানসিক সংকট এবং সার্বিকভাবে রাষ্ট্রীয় সংকটকে তুলে ধরেছেন তাঁর কবিতায়। যা তাঁর জীবনদর্শনে ব্যক্তিক আশা, নিরাশা ও হতাশার ছবিরূপে প্রকাশিত। তিনি দার্শনিক কবি বলেই শৈশব-কৈশোরে পিতৃ-মাতৃ বিয়োগের মন্দভাগ্যকে ভাবনায় নিয়েছিলেন পূর্ণাঙ্গ মানুষ গড়নের সূতিকারুপে, যা তার কবিতায় উঠে এসেছে এভাবে-

দেখেছি পিতাকে লাবণ্যের বাল্যকাল ছিঁড়ে
কবরখানার দিকে চলে যেতে, কৈশোরে মা'কেও;
শক্ত ছুড়িতে বেঁধা অসংখ্য মৃত্যু পার হ'য়ে
নিদারুণ এক পাকাপোক্ত মানুষের মতো।
(শ.ক, প্রাগুক্ত, একটা মরা শালিক, পৃ: ১২১)

কবি জীবনকে মুক্ত আবহে উপলব্ধি করেছেন। শহীদ কাদরী জীবনের বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সত্য উপলব্ধির নিগূঢ়চেতনাকে তুলে এনেছেন তাঁর দর্শনচেতনায়। যার নির্যাস নিম্নরূপ–

এবার অপার স্বাধীনতা, যদি নেহাৎ ব্যক্তিগত। / তবুও আর তো পরাধীন নই আমি' এবং দেশ রাষ্ট্রে অত্যধিক অভিভাবকতার পীড়নে সমাজতন্ত্র , রাষ্ট্রতন্ত্র , গণতন্ত্রের অপমৃত্যু হয় জেগে ওঠে স্বৈরতন্ত্র। সব রকমের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে কবির অবস্থান সুদৃঢ় কারণ কবিকে সেই চেতনাই ধারণ এবং লালন যে করতে হয়। এই প্রজ্ঞা- অভিজ্ঞতা- বুদ্ধিই প্রকৃত দর্শন যে। (শালুক, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫৫)

শহীদ কাদরী মাইকেল ও তিরিশের আধুনিকতাকে মনে প্রাণে ধারণ করে কাব্যযাত্রা শুরু করলেও বিশ্বপ্রেক্ষাপটে তাঁর কাব্যদর্শনকে মিলিয়ে নিতে অভিলাষী হন। টি.এস. এলিয়ট, এজরা পাউণ্ড, ডব্লিউ এইচ অডেন, শার্ল বোদলেয়ার, ব্রায়ান, প্যাটেন, আড্রিয়ান হেনরী, এ্যালেন গিনসবার্গ তাঁকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। সেইসাথে তিনি প্রভাবিত হন ফ্রয়েড, হিউম, এরিক ফ্রমের মতো জগদ্বিখ্যাত দার্শনিকদের দ্বারাও। বিশেষত ১৯৫৮ সালের পর শহীদ কাদরী খালেদ চৌধুরী ও সুকুমার মজুমদার এর সাথে পরিচয়ের পর উপলব্ধি করেন জীবনের অর্থ সত্যের উদ্‌ঘাটন এবং তা একমাত্র দর্শনেই সম্ভব। শহীদ কাদরীর দর্শনচেতনা সজ্ঞাজাত চিন্তনে, মেধায় ও বক্তব্যে বহুমাত্রিকরূপে প্রকাশিত। যার রেখাচিত্র নিম্নে বর্ণিত হল–

অস্তিত্ববাদ

অস্তিত্ববাদী চিন্তাভাবনার উন্মেষ ঘটে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। যার বিস্তৃতি ঘটে বিশ শতক জুড়ে। সক্রেটিস, থমাস অ্যাকাইনাস, দের্কাতে, কান্ট, হেইডেগার, নিৎসে, জাসপার্স, মার্সেল, সার্ত্রের এর অস্তিত্ববাদী চিন্তনে আগে ব্যক্তিসত্তা এবং পরে ব্যক্তিসত্তার সার বা নির্যাস নিহিত ।

সার্ত্রে অস্তিত্ববাদ সম্পর্কে চারটি গুরুত্বপূর্ণ সার্বিক সত্তার কথা বলেছেন। তার সারর্থ হলো, প্রথমত- মানুষ স্বাধীন। দ্বিতীয়ত- সে অপরিহার্যভাবে অবস্তু। তৃতীয়ত -সে সর্বদা স্বাধীনভাবে সকলের মঙ্গলময় কাজ নির্বাচন করবে। অর্থাৎ মানুষ দায়িত্ববান হয়ে উঠবে। চতুর্থত -সে ঈশ্বর হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টিশীল বলেই সে প্রায় ঈশ্বর হয়ে ওঠে। সুতরাং অস্তিত্ববাদ বলছে সত্য মানুষের মনের উপলব্ধি।

> শহীদ কাদরী তীব্রভাবে অস্তিত্বচেতন কবি। অস্তিত্ববাদের ইংরেজি প্রতিশব্দ Existentialism, অস্তিত্বের বিপন্নতায় মানুষ আবার টিকে থাকতে চায়। অর্থাৎ পৃথিবীতে মানুষের থাকা চেতন অবচেতন সারবস্তুর সঙ্গে যে কোনো সম্বন্ধযুক্ত হয়ে আবদ্ধ থাকার নামই হচ্ছে অস্তিত্ব। অস্তিত্বচেতন আসে সমাজ, সময় ও প্রেমচেতনার সূত্রে।
> (বায়তুল্লাহ কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬০),

শহীদ কাদরীর কবিতায় অস্তিত্বচেতনা এসেছে দ্বিমাত্রিক ধারায়। একদিকে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের বিশেষত জ্যাঁ পল সার্ত্রের জীবনদর্শন। অন্যদিকে বিরুদ্ধসময়, শিল্পী মানসের নিঃসঙ্গতা ও আত্মপ্রকাশের অন্তচাপ। যা তাঁর কবিতায় প্রকাশিত–

> শীতার্ত নিঃস্বতায় কিছুই বাঁচে না যেন /বেঁচে থাকা ছাড়া বসন্তের শিথিল স্তন
> নিঃশেষে পান করে মাটি /...অথচ এই শীতে একা , উদ্ধত আমি
> আমি শুধু পোহাই না ম্লান রোদ /...
> লক্ষ সূর্যে আসা যাওয়া এবং সেও একা /
> আমারই আত্মার মত প্রাঙ্গনের তরুণ কুকুর।
> (শ.ক, প্রাগুক্ত, এই শীতে-পৃ: ৫১)

শহিদ কাদরী বিশ্বাস অবিশ্বাসের অন্তরদ্বন্দ্ব উপলব্ধি করেছেন। সেই সাথে জীবনকে দেখার অন্তরক্ষয়ী প্রেক্ষিত তিনি তুলে এনেছেন 'বিশ্বাস-অবিশ্বাসের গল্প' কবিতায়। এখানে কবি একটি মৃত শালিকের নিথর পা-কে টেলিভিশনের অ্যান্টেনার মত শূন্যে ঝুলে থাকতে দেখেছেন। সেইসাথে লাল পিপড়েদলের মৃত শালিকের চোখের মণি খুটেখুটে খাওয়ার পৈশাচিক দৃশ্য কবির বিশ্বাস-অবিশ্বাসকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। যা কাব্যরূপে প্রকাশিত–

> একটা মরা শালিক / টেলিভিশনের অ্যান্টেনার মতো

শূন্যে দুপা তুলে/ নিশ্চিন্তে রয়েছে পড়ে ।
আর লাইন দিয়ে সারি সারি লাল পিপঁড়ে /
শালিকটার চোখের মণি খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে ।
.../এভাবেই আমার বিশ্বাসগুলো /
পাখির চোখের মতো খুঁটে খুঁটে
খেয়ে ফেলেছে দুপুরবেলার সেই লাল পিপড়েগুলো ।
(শ.ক, প্রাগুক্ত, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের গল্প, পৃ:২৯)

জীবনসঙ্কট মুহূর্তেও কবি ক্ষয়িত জীবনের অনিঃশেষ টিকে থাকার জয়গান গেয়েছেন। 'প্রার্থনা করছি আমি উত্থান তোমার কণ্ঠস্বরের' কবিতায় কবি ছুরিকাঘাতে বিদ্ধ মানুষের চিৎকার কিংবা গুলিবিদ্ধ আহত কাকের বিপর্যয় থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন–

ছুরি বেঁধা মানুষের চিৎকার /বন্দুকের গুলির শব্দ
ছররা খাওয়া কাকের আর্তনাদ /কারও ঘর ভেঙে পড়ার
.../ মর্ম থেকে আমাকে নিস্তার দাও।
(শ.ক, প্রাগুক্ত, প্রার্থনা করছি আমি উত্থান তোমার কণ্ঠস্বরের, পৃ:৩৪)

জীবন মুক্তি আকাঙ্ক্ষার কবি শহীদ কাদরী জীবনের ছেদ নয়, বন্ধনপূর্ণ জীবনের প্রত্যাশী ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে জীবনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রনের ট্রাফিক আইল্যান্ড তথা অলীক ডাক্তার অভিধায় সম্বোধন করে মুক্তির বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছেন এভাবে –

হে রবীন্দ্রনাথ /...হে অলীক ডাক্তার.../ আমি তাই তোমাকে এক আলমিরা/
নিদ্রার বর্ণালি বড়ি ভেবে শঙ্কিত, সন্ত্রস্ত রাতে /নির্ভয়ে বাড়িতে ফিরে / জামা না খুলেই
নিঃশব্দে চিৎপাত হয়ে /রাতভর দেখেছি কেবল ওষুধের শিশির মতন।
(শ.ক, প্রাগুক্ত, রবীন্দ্রনাথ-৭৭পৃ:)

অস্তিত্ব দর্শনে প্রকৃতির সংলগ্নতাকেও কবি নিজের জীবনের প্রতি আনুগত্য স্বীকারের ছবিরূপে উপস্থাপন করেছেন। জীবনবোধিতে সুরমুক্তি তথা স্বস্তির বার্তা প্রকাশ করে কবি প্রকৃতির সংলগ্নতায় মুক্তির ইচ্ছাকে লালন করেছেন এভাবে–

ইতিহাসের তমসায় সশঙ্কিত শামসুর রাহমান /দাঁড়িয়ে আছেন চন্দ্রাঙ্কিত মুখে
আর মুহ্যমান আল মাহমুদ চট্রগ্রামে টিলার ওপর /বুকে পুরে ঝোড়ো আবহাওয়া।
বেচেঁ আছে তোমারই অশেষ কৃপায় .../.হে নিসর্গ ,হে প্রকৃতি , হে সুচিত্রামিত্র

হে লঙ -প্লেয়িং রেকর্ডের গান /হে বিব্রত বুড়ো আংলা তুমি গীত বিতান আমার।

(শ.ক, প্রাগুক্ত-নিসর্গের নুন, পৃ: ৪২)

প্রকৃতিকে কবি 'নিপুণ জেলে' বলে অভিহিত করেছেন 'একটি ব্যক্তিগত বিপর্যয়ের জার্নাল' কবিতায়। অস্তিত্বচেতন শহীদ কাদরী তীব্রভাবে ব্যক্তিমানসে অস্তিত্বকে প্রকৃতি ও দেশমাতাকে গভীরভাবে অনুভব করেছেন। যা তাঁর স্বদেশপ্রীতিমূলক কবিতায়–'কবিতা অক্ষম অস্ত্র আমার', 'নিষিদ্ধ জার্নাল থেকে' আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে –

একটি আংটির মতো তোমাকে পরেছি স্বদেশ

আমার কনিষ্ঠ আঙ্গুলে, কখনও উদ্ধত তলোয়ারের মতো

দীপ্তিমান ঘাসের বিস্তারে, দেখেছি তোমার ডোরাকাটা /জ্বলজ্বল রূপ জ্যোৎস্নায় ।

(শ.ক, প্রাগুক্ত, ব্লাকআউটের পূর্ণিমায়, পৃ: ৮৭)

অথবা,

এমন কি গ্রাম-মোড়লের ট্রাঞ্জিসটারের হাত থেকে/

প্যাই নি রেহাই–মরক্কো,স্প্যানিশ সাহারা,সাজোয়া বাহিনী এবং/

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি,গাছের মর্মর,

তেপান্তরের মাঠ জুড়ে ভয়ঙ্কর সিগন্যালের মতো

ফসফরাসের নাচ! এই সব দেখে দেখে দেখে

আমার স্বপ্নের মধ্যে জ'মে উঠেছিল মরা পাখিদের স্তূপ।

(শ.ক, ৩/২৬-খুব সাধ করে গিয়েছিলাম, পৃ: ১৫৪)

অস্তিত্বচেতন কবি 'একটি মরা শালিক' কবিতায়ও তীব্রভাবে অস্তিত্ববোধের প্রসঙ্গে বিবর্ণ হলুদকে তাঁর অভিভাবকত্বের প্রশ্নে বিদ্ধ করেছেন। ষাটের দশকে কবিদের মধ্যে এই অস্তিত্ববোধ এলোমেলো অসংখ্য পালক সৃষ্টি করেছে বিরুদ্ধ চেতনায় অর্থাৎ প্রচলিত রীতি ও গতানুগতিকতার প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, যার ধ্বনিত প্রকাশ 'বৃষ্টি বৃষ্টি 'কবিতায় পরিলক্ষিত হয় –

এই ক্ষণে আঁধার শহরে প্রভু, বর্ষায়, বিদ্যুতে

লগ্নপায়ে ছেড়া পাৎলুনে একাকী

হাওয়ায় পালের মতো শার্টের ভেতরে/

ঝকঝকে, সদ্য নতুন নৌকোর মতো একমাত্র আমি ...

কোন আগ্রহে সম্পন্ন হয়ে, কোন শহরের দিকে

জলের আহ্লাদে আমি একা ভেসে যাবো। (শ.ক, ১/১- বৃষ্টি বৃষ্টি, পৃ: ১১)

কবির তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ-*‘ কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই ’*। এখানে ক্রন্দনহীনতা যেন ক্রন্দনরত মানব অস্তিত্বে প্রকাশ। জীবনের সব পরাজয় জৈবিক ক্ষতি, ক্ষমতাহীনতা, ব্যর্থতা, এবং স্বজন বিয়োগ সত্ত্বেও মানুষ চায় তার নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে, চায় বেঁচে থাকতে। প্রিয় মানুষ তার রসনাকে পরিতৃপ্ত করতে আরো একটু জর্দা চায়। সে চায় রাজাধিরাজের মতো স্থবির, নিঃস্পন্দ স্বায়ত্তশাসিত হৃদয় নিয়ে অস্তিত্ববান হতে।তাই কবিও সব শোক, প্রেম, হতাশার পরপারে দাঁড়িয়ে অস্তিত্বকামী হয়ে উঠার ছবি এঁকেছেন তাঁর কবিতায়।

বিচ্ছিন্নতাবোধ

শহীদ কাদরীর বিচ্ছিন্নতাবোধ কখনো অস্তিত্বসঙ্কট জনিত প্রতিক্রিয়ায়, কখনো অভিযোজন অক্ষম মানসিকতায় কিংবা সমাজ জীবন ও ব্যক্তিসত্তার শত্রুভাবাপন্ন চেতনা থেকে প্রকাশিত। কবি তার স্বদেশ বিচ্ছিন্নতাকে মরণসম জীবনরূপে অনুভব করেছেন। আবার কবি আধুনিক মানুষের স্বকীয় সত্তা থেকে বিচ্ছিন্নতার কথাও প্রকাশ করেছেন। যা তাঁর কবিতায় প্রকাশিত–

কৈশোরের শূন্যতা হয়ে উঠেছে/ধ্বনিময় এক্কাদোক্কা খেলায়
...ঊর্ধ্বশ্বাসে এই উত্তর পঞ্চাশেও আমি/নানা রঙবেরঙের শব্দের সম্ভারে
শূন্যতাকে বাজিয়ে বাজিয়ে/ অন্য যেসব শূন্যতার দিকে যাচ্ছি
সেখানে কোন ধ্বনি পৌছুবে না/ না কোমলগান্ধার, না কোনো অমর ধ্রুবপদ
(শ.ক, অমার চুম্বনগুলো পৌছে দাও, পৃ ৪৯)

এই বিচ্ছিন্নতাবোধ তথা অন্ধকারময় যন্ত্রনাক্ত অস্তিত্বের অনুভব জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথের ন্যায় শহীদ কাদরীকে পীড়িত করেছে। স্বদেশ থেকে স্বেচ্ছা -নির্বাসনের বিচ্ছিন্নতা কবির অন্তরে রক্তক্ষরণ করেছে। যার প্রকাশকরূপ তাঁর কবিতায় বর্তমান –

দ্যাখো ভয় আমি পাই /কেননা ইতিহাসের অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে
আজ আমি জরাগ্রস্ত। বন্দী একটি বিদেশী বারান্দায় ।
হ্যাঁ বিচ্ছেদ তা যত ক্ষণকালীনই হোক/ তাকে আমি ভয় পাই ।
সব বিচ্ছেদের মধ্যেই রয়েছে মৃত্যুর স্বাদ। (শ.ক,অপেক্ষা করছি,পৃ:১৭)

একাকিত্বের অনুভব সভ্যতার প্রারম্ভ থেকে মানুষকে সংক্রমিত করলেও আধুনিককালে বিচ্ছিন্নতা একান্তই আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে। বিচ্ছিন্নতাবোধ কবিকে বোহেমীয় চেতনায় উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে উদ্দীপ্ত করে।

আমার মতন ভ্রাম্যমাণ এক বিহ্বল মানুষ /ঘরের দিকেই/
ফিরতে চাইবে ...

আমি ভ্রাম্যমাণ /কিন্তু এই নিরুদ্দেশ যাত্রা ঘরের দিকেই পদব্রজে,
হামাগুড়ি দিয়ে,গিরগিটি বা সাপের মতো /
বুকে হেঁটে হেঁটে /কিমাশ্চর্য ...
যে আমাকে জানিয়েছিল বিদায়, সেই ছায়া মূর্তি
আজো, এখনো, আমাকে লক্ষ্য করে উড়িয়ে /
চলেছে একটি বিদায়ী রুমালে । (শ.ক, নিরুদ্দেশ যাত্রা, পৃ: ৬৩)

যাযাবর কবি শহীদ কাদরী একাকিত্বজনিত ভয়াল নিঃসঙ্গবোধের চিত্র তাঁর কবিতায় তুলে আনেন অনুপমভাবে। এ কবিতায় কবি ব্যক্তি স্বতন্ত্রে অনেক কিছু পাওয়ার সুযোগ থাকলেও নিঃসঙ্গ নাগরিক সত্তা গণতান্ত্রিকভাবে সিদ্ধান্ত প্রকাশের প্রয়াস পায়। যার কাব্যরূপ–

ঢিলে- ঢালা হাওয়ায় ফোলানো ট্রাউজার /বিপর্যস্ত চুলে
উৎসবে ,জয়ধ্বনিতে আমি /ফুটপাত থেকে ফুটপাতে ,বিজ্ঞাপনের লাল আলোয়
সতেজ পাতার রঙ সেই বিজয়ী পতাকার নীচে /কিছুক্ষণ একা ...
আর আমার পকেটভর্তি স্বপ্নের ঝনৎকার /জয়ধ্বনি থেকে ক্রন্দনে আমি
উদ্ধত পতাকার নীচে একা, জড়োসড়ো /আমি কিছুই কিনব না।
(শ.ক, প্রাগুক্ত, আমি কিছুই কিনব না, পৃ: ১৭)

শাহরিক জীবনের অনিবার্য কঠিন বাস্তবতায় বিশেষ করে -গ্রামীণ নস্টালজিক চেতনা থেকে এই বিচ্ছিন্নতা বোধ কাজ করেছে। এই বিচ্ছিন্নবোধ নাগরিক চেতনায় কেন্দ্রিভূত হয়ে আরও সুগভীরভাবে প্রত্যক্ষ হয়েছে তাঁর কবিতায়–

কবিতাই আরাধ্য আমার , মানি ;এবং বিব্রত/
তার জন্য কিছু কম নই । উপরন্তু আছি পড়ে উপাধিবিহীন ,জানি/
বানিজ্যে বসতি যার সেই মা লক্ষ্মীর সংসারে / উন্মুল , উদ্বৃত্ত , তবু
কোনমতে টিকে -থাকা, যেন বেঢপ ভূমিকাশূন্য তানপুরা ।
(শ.ক, ১/১৩-কবিতাই আরাধ্য জানি, পৃ: ২৯)

'কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই' কাব্যগ্রন্থের – 'খুব সাধ করে গিয়েছিলাম' কবিতায় কবি সাদ করে বালিহাঁস শিকারে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে গ্রামের মানুষের বালিহাঁসের মাংস খাওয়ায় বিস্মিত ও বিপন্নতা বোধ করেছেন। এই বিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করা যায় তাঁর 'খুব সাধ করে গিয়েছিলাম' কবিতায়। তারই কাব্যরূপ –

দো–নলা বন্দুকটার কথা বলা হলো না,/
অথচ ওটাই আসল। শিকার করেছিলাম
ঝাঁকে ঝাঁকে বালিহাঁস। দেখলাম গ্রামবাংলার/

কাদা মাটা সরল লোকগুলো ঐ পাখিদের মাংস

খুব পছন্দ করে চেটেপুটে খেলো।

(শ.ক, ৩/২৬- খুব সাধ করে গিয়েছিলাম, পৃ:১৫৪)

তাই সংবেদনশীল কবি সৃষ্টিজগতে বিচ্ছিন্নতার ঘটনায় শূন্যতা অনুভব করেন। যা তাঁর কবিতার ভাষারূপ হয়ে উঠে।

মার্কসবাদ

নাগরিক কবি শহীদ কাদরীর কবিতায় মার্কসীয় চেতনা পরিলক্ষিত হয়। মার্কসবাদ হলো ঊনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, সাংবাদিক এবং বিপ্লবী কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক অনুশীলন ও সামাজিক তত্ত্ব। প্রায়োগিক বিবেচনায় মার্কসবাদ হচ্ছে মালিক শ্রেণির তথা বুর্জোয়া শ্রেণির শোষণ- নির্যাতন, নিপীড়ন তথা মজুরি দাসত্ব থেকে প্রলেতারিয়েতের বা শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির মতবাদ। (উইকিপিডিয়া)

অবহেলিত মানুষের অধিকার আদায়ের স্বার্থে ধনী -মহাজন অত্যাচারী প্রভুদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তথা 'অন্যায়ের নিধন, সাম্য সাধনে' নজরুল- সুকান্তের মতো শহীদ কাদরীর কবিতায়ও সক্রিয়। শ্রমিক শ্রেণির আহ্বান ও ধনতন্ত্রের মৃত্যুদন্ড কামনা করেছেন মার্কস, যা শহীদ কাদরীর অভীপ্সা হয়ে উঠেছে তাঁর সৃষ্ট কবিতা 'আমি কিছুই কিনব না 'তে। একইভাবে 'বৃষ্টি বৃষ্টি' কবিতারও ভেতরের কথাটা হচ্ছে - পুঁজিবাদী সমাজে বহিরাগতের মতো জীবন যাপন। সেখানে একজন হতাশাগ্রস্ত লোক ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, যার কোন রুট নেই । আর 'আমি কিছুই কিনব না ' কবিতায় সেই রুটহীন লোকটির সামনে আধা পুঁজিবাদী, আধা সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু সে সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করেছে অথচ কোথাও বলা হচ্ছে না সে মার্কসীয় চেতনাধারী। কিন্তু শহীদ আগাগোড়াই মার্কসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। যার প্রকাশ –

চারিদিকে রঙবেরঙের জামা- কাপড়ের দোকান/

মদিরার চেয়ে মধুর সব টেরিলিনের শার্ট

.../আমি অবহেলে চলে যাবো , যাই/

আঁধার রাস্তার রাণী চকোরীর মত বাঁকা চোখে দ্যাখে/আমি কিছুই কিনব না ।

(শ.ক, প্রাগুক্ত, আমি কিছুই কিনব না, পৃ: ১৭)

উত্তরাধিকার কাব্যের প্রথম কবিতা 'বৃষ্টি বৃষ্টি' কবিতাতেও কবির অভিব্যক্তি বুর্জোয়া সভ্যতাকে একদিন একটি অবিশ্বাস্য স্বতঃস্ফূর্ত শক্তি এসে ধ্বংস করে দিয়ে যাবে। যার প্রমাণস্বরূপ-

কিন্তু সাড়া নেই জনপ্রাণীর অথচ /জলোচ্ছ্বাসে নিঃশ্বাসের স্বর , বাতাসে চিৎকার

কোন আগ্রহে সম্পন্ন হয়ে, কোন শহরের দিকে /জলের আহ্লাদে আমি একা ভেসে যাবো।
(শ.ক, প্রগুক্ত, 'বৃষ্টি বৃষ্টি', পৃ:১১)

শহীদ কাদরীর চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ' *'আমার চুম্বনগুলো পৌছে দাও'* (২০০৯) তে বৈশ্বিক পটভূমি জুড়ে রয়েছে- সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের আত্মময় সংকট ও তা নিয়ে কবির হতাশা এবং উদ্বেগ। শ্রেণিহীন সমাজ তথা একটি কল্যাণময় মানব সমাজের জন্য তাঁকে এখানে আমরা উন্মুখ দেখি। মার্কস বলছেন যে –

রাষ্ট্র হলো একটা শোষণের যন্ত্র, যার মাধ্যমে upper বা dominating class তার মতো করে খেলাটা সাজায়, নিয়ন্ত্রণ করে। ক্যাপিটালিজম এর সাথে আঁতাতের মতো করে সম্পৃক্ত। শহীদ কাদরীর মধ্যেও মার্কসীয় চিন্তাভাবনার প্রভার যথেষ্ট। বিপ্লব হবে, সর্বহারার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, কমিউনিস্ট পার্টি রাষ্ট্র গঠন করবে এটাই ছিল মার্কসবাদের teleology। এই মার্কসীয় চিন্তা ও বিপ্লব সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে আশার দিকে নিয়ে গিয়েছিল । মিছিলের মুখ ,লাল টুক টুকে দিন প্রভৃতি কবিতায় একজন নারীর ছবি আঁকা হয়েছে , যিনি কিনা গোটা মিছিলের সত্তাটিকে ধরতে সক্ষম এবং যার দ্বারা কবি অনুপ্রাণিত। কিন্তু শহীদ কাদরী পারিপার্শ্বিককে অবলোকন করে সীমাহীন নিরাশার ভেতরে বাস করেছেন। (শালুক, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৭৮)

তাই শহীদ কাদরীর কবিতায় উঠে এসেছে যুদ্ধবিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ বিরোধী পঙক্তি। 'তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা' কবিতায় কবি দেশমাতাকে প্রিয়তমা বলে সম্বোধন করেছেন এবং স্বদেশমুক্তির প্রয়াসে ফ্যান্টাসির মাধ্যমে সেনাবাহিনী কর্তৃক গোলাপগুচ্ছের মাধ্যমে দেশমাতাকে অভিবাদন ও সম্মাননা প্রদান করেছেন। যার কাব্যিক প্রকাশ–

আমি এমন ব্যবস্থা করবো যাতে সেনাবাহিনী /গোলাপের গুচ্ছ কাঁধে নিয়ে /
মার্চ পাস্ট ক'রে চ'লে যাবে /এবং স্যালুট করবে /কেবল তোমাকে প্রিয়তমা ।
(শ.ক, প্রগুক্ত, তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা, পৃ: ১১১)

ক্যাপিটাল মানেই বিরাট বাজার । কবি তাঁর কবিতায় সমকালীন চিরাচরিত মূল্যবোধ, ধনতন্ত্রের নতুন জৌলুস পুরোটাকেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। যা ধ্বনিত হয়েছে তাঁর 'স্বতন্ত্র শতকের দিকে 'কবিতায় ...

এক রঙবেরঙের শতচ্ছিন্ন তালি- মারা জনগণতান্ত্রিক জামা /
পরে আছি আমরা । এখনো উৎসবের সারি সারি/
ঝাড় লন্ঠনের মতো সুষম ধন বন্টনের প্রতি আমাদের অনুরাগ/
ঝলমল করছে এক নির্বোধ বিশ্বাসে /কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতো
এসে লাগে টেলিভিশনে যখন / লেলিনের ভুলুণ্ঠিত মূর্তি দেখে পশ্চিমা পন্ডিতকুল
মেতে উঠে অশ্লীল উল্লাসে। (শ.ক, প্রাগুক্ত, স্বতন্ত্র শতকের দিকে, পৃ: ১৪)

শ্রেণীসাম্য তথা সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা শহীদ কাদরীর মধ্যে প্রবলভাবে লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'বিপ্লব' কবিতাটি অগ্রগণ্য। এ কবিতায় কবি অধিকার যে আপনা আপনি আসে না, তাকে বুদ্ধি দিয়ে সমচেতনায় অর্জন করতে হয় বাস্তবতার নিরিখে। সে অভিব্যক্তি এখানে প্রকাশিত –

মনজুর এলাহী আবার বললেন, বন্দুকের নলই
শক্তির উৎস। রক্তপাত ছাড়া শ্রেণীসাম্য প্রতিষ্ঠা
অসম্ভব, অনায়াসে কেউ শ্রেণীস্বার্থ ছেড়ে দেয় না।
(শ.ক, প্রাগুক্ত, বিপ্লব, পৃ: ২১)

গণজাগরণই এই গণতান্ত্রিক চেতনা প্রতিষ্ঠার অস্ত্র হতে পারে বলে কবি বিশ্বাস করতেন। যা তাঁর কবিতায় প্রকাশিত–

মার্কসবাদী বিপ্লব অর্থাৎ অনবরত/গণ-অভ্যুদয় ছাড়া
আমাদের এই বিব্রত তৃতীয় বিশ্বে /অন্য কিছু কবিতার
বিষয় অথবা বস্তু হতে পারে না কিছুতেই/এইটুকু লিখে আমাকে থামতে হলো।
(শ.ক, প্রাগুক্ত, তুমি, পৃ: ২৭)

সেই সাথে শ্রেণীসাম্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা কবির আমৃত্যু ছিল। যে কারণে কবি 'অন্তিম প্রজ্ঞা' কবিতায় ফাঁসিকাষ্টে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও শ্রেণিসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিবাদী হয়ে উঠার কথা বলেছেন।-যা তাঁর সৃষ্টিকর্মে এনে দিয়েছে অনন্যমাত্রা –

নৃশংস একনায়ক কিংবা স্বেচ্ছাচারী কোনো মূঢ়/ জেনারেলের নির্দেশে
যদি আমাকে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয় ফাঁসির মঞ্চে,
আমি কি রজ্জু থেকে ঝুলে পড়ার আগে চিৎকার করে উঠবো; শ্রেণীসাম্য ছাড়া
নিস্তার নেই নিরন্ন মানুষের।
(শ.ক, প্রাগুক্ত, অন্তিম প্রজ্ঞা- পৃ: ৫০)

শহীদ কাদরী আদ্যপান্ত গণমানুষের শ্রেণীসাম্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে কথা বলেছেন। যা *'গোধূলির গান'* কাব্যের 'পরিক্রমা' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে প্রকৃতিময়তায় ঔপনিবেশবাদ থেকে সর্বহারাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন কবি–

হরিৎ ঘাসের রেখা ধরে ধরে/...
দেখলাম কত খেতের আলোতে/মরে পড়ে আছে মরদ -জোয়ান।
আর নির্ভয়ে ঘুরে ঘুরে নামে শকুনির দল। (শ.ক, 'গোধূলির গান' কাব্য, পরিক্রমা, পৃ:২৭)

শহীদ কাদরী আজন্ম কাল ধরে মার্কসবাদী চেতনাকেই ধারণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে সাদ কালামি কর্তৃক গৃহীত কবির একটি সাক্ষাৎকার– তিনি বলেন

> 'শিল্পসাহিত্যর ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন তখনই সঙ্ঘটিত হয় আমার ধারণায় যখন আত্মসামজিক স্থিতাবস্থার স্তরগুলো একে একে ধূলিসাৎ হতে শুরু করে এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে নবীনতর বিশ্ববীক্ষা ক্রমশ ফেনায়িত হয়ে ওঠে। আধুনিক শিল্পের ভিত্তিভূমি হচ্ছে বিশ্বব্যাপি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের উত্থান এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা নামক নতুন মূল্যবোধের উদ্বোধন।(শালুক- প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৯২)

যার উপস্থাপিত রূপ–

> তরঙ্গগুলো ভীষণ বিক্ষুব্ধ মাঝরাতে /...
> এই স্লোগান চঞ্চল জলরাশি ? সুষম ধন-বন্টন চায়
> অনটন ভরা নিরন্নের সংসারে? চায় অবসান
> স্বৈরাচারের? তৃতীয় বিশ্বের নক্ষত্রপুঞ্জের মতো রাষ্ট্রসমূহে
> উত্থান চায় বিপ্লবরি? নাকি বিনষ্টি চায় / শুধু নষ্ট হয়ে যাওয়া /এই ক্রন্দনহীন গ্রহের?
>
> (শ.ক, প্রগুক্ত,কাক, পৃ: ৬০)

অবক্ষয়ীচেতনা

বিচ্ছিন্নতাবোধ জনবসতিকে ধাবিত করেছে অবক্ষয় চেতনায়। হতাশা , নৈরাশ্য, আত্মনির্যাতনের উপায়রূপেই কবিরা অবক্ষয়িত জীবনের মধ্যে প্রবেশ করেন। বোদলেয়ার, এলিয়টের রচনায় এ অবক্ষয়বাদের সূচনা ঘটে। মূলত উনিশ শতকের শেষদিকে শিল্পসাহিত্যে ফ্রান্সে এ অবক্ষয়বাদের সূচনা ঘটে। মূলত আত্মবিধ্বংসী প্রবণতায় কবিরা এ অবক্ষয়কে ধারণ করেন। বোদলেয়ার যেমন শুদ্ধ হতে চেয়েছিলেন যৌনতা, সুরা, অহিফেন ও গঞ্জিকার মাধ্যমে। শহীদ কাদরীও তাঁর কবিতায় গঞ্জিকার তথা গণিকাবৃন্দকে 'আলোকিত রুগ্ন গোলাপ দল' নামে অভিহিত করেন। যার উচ্চারিতরূপ –

> দিকভ্রান্তের ঝলক তোমরা, নিশীথসূর্য আমার।
> যখন রুদ্ধ হয় সব রাস্তা, রেস্তোরা, সুহৃদের দ্বার ,
> দিগন্ত রাঙিয়ে ওড়ে একমাত্র কেতন, তোমাদেরই উন্মুক্ত অন্তর্বাস,
> অদ্ভুত আহ্বান যেন অস্থির অলৌকিক আজান।
> সেই স্যাঁতসেতে ঠাণ্ডা, উপাসনালয়ে পেতে দাও
> জায়নামাজ, শুকনো কাঁথা, খাট, স্তূপ স্তূপ রেশমের স্বাদ।
> আলিঙ্গনে , চুম্বনে ফেরাও শৈশবের অষ্ট আহ্লাদ।
> (শ.ক,১/২৬-আলোকিত গণিকাবৃন্দ-৪৭ পৃ:)

শহীদ কাদরীর কবিতায় শহরচেতনা ও নাগরিক বৈদগ্ধ্যে নিরেট কাঠিন্যে অবক্ষয়ের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। নগরের রাত , ময়লা সৌরভের আলোকিত গণিকাবৃন্দ, রাত্রিকালীন রহস্যপূর্ণ নগর ও ভূদৃশ্যচিত্র, কামনা ও নপুসকের জীবন ও আকুতি তাঁর কবিতায় প্রকাশিত–

যুদ্ধ হত্যা মারী ও মড়ক/তবুও বলি না খিন্নস্বরে ,
যাক চুলোর ভিতরে যাক এই মরলোক '
হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকি নিজের বিবরে
জীবনের নাম শুনে থুতু ছুঁড়ে 'নরক! নরক!...
নরক তো পিতার শিশ্ন, মায়ের জরায়ু
নরকেই পেতে চাই দীর্ঘ পরমায়ু ।
(শ.ক, ৩/১৮-চায় দীর্ঘ পরমায়ু, পৃ: ১৪১)

কবির কবিতায় জীবনভাবনায় মূল্যবোধের অবক্ষয়িত রূপও লক্ষ্যযোগ্য বিষয়। 'আজ সারাদিন' কবিতায় মূল্যবোধহীন প্রাণ হত্যার অবক্ষয় দেখা যায়। অসহায় শালিককে নির্মমভাবে হত্যা এবং তা পরে গ্রাস করার প্রক্রিয়া অবক্ষয়িত মানসিকতারই প্রকাশ। যার কাব্যরূপ–

জরা , মৃত্যু, আর্তির চন্দন ফোঁটা তার অবয়বে /
প্রশান্ত করেছে তাকে সন্ধ্যার মতোই আগাগোড়া,
আততায়ী ,– লুকিয়ে রয়েছে প্রেমিকার অনুনয়ে/
অনুজের মূল্যবোধ, আমাদের উদ্বাস্তু দশকে ...
কবিতার শুঁড়িলোকে , মদ্যপের কণ্ঠনালী বেয়ে/
মিশে যাই পাকস্থলীর , প্লীহার অম্ল রসায়নে।
(শ.ক, ১/১৪-নিরুদ্দেশ যাত্রা, পৃ:৩০) কিংবা
তোমার বাড়ির /কিন্নরকণ্ঠ নদী অবধি আমি গিয়েছিলাম।
কিন্তু হাতভর্তি শালিকের পালক /আর চুলের মধ্যে এলোপাতাড়ি বৃষ্টির ছাঁট নিয়ে ...
ঐ শালিকের ভেতর উনুনের আভা, মশলার ঘ্রাণ।
(শ.ক, ৩/১-আজ সারাদিন, পৃ:১১৬)

কবি মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয় গভীর পর্যবেক্ষণশীলতায় প্রকাশ করেছেন। সেইসাথে নাগরিক জীবনের অবক্ষয়গুলো কবি অনেকটা স্বীকারোক্তিমূলক জবানিতে প্রকাশ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ–

ছন্দিত ঘূর্ণির রেখায় নিথর ঘাঘরার মত/ যুগপৎ নৃত্যরত এবং সুস্থির,
প্রত্যক চরণাঘাতে মুহূর্ত জ্বলে ওঠে গোলাপপুঞ্জের মত,.../
চোখের আঁধারে ঐ স্বর্গের ডাইনী যেন গতির পুলকে/

কী তীব্র জ্যোৎস্না হেনে যায়/ কী তীব্র জ্যোৎস্না হেনে যায়।

(শ.ক, /১/৩৫-নর্তকী-, পৃ: ৫৭)

পঙ্কিল জীবনের প্রতি আকর্ষণ ও পাপ পুণ্যসম্পর্কিত প্রচলিত ধারণার বিপরীতে অবস্থান করে ও নারীর শরীরী প্রেমের মধ্যে নিমজ্জিত চিত্রপট এঁকেও কবি অবক্ষয়িত রূপ প্রকাশ করেছেন। যার প্রকাশরূপ–

আত্মজনের প্রতিশোধের স্পৃহার ধারে /কাটামুন্ডু নৃত্য করে ...

ভালোবাসার কালো চুলের তীক্ষ্ণ কামের /সফেদ স্তনের পীনোন্নত চূড়ার বেঁধা

শহীদ প্রেমিক কাৎরে ওঠে,

(শ.ক, ২/২১-ছুরি- পৃ: ৯৫)

মানবতাবাদ

শহীদ কাদরী জীবনাভিজ্ঞতায় পরিপুষ্ট হয়ে জীবের প্রতি মানবীয় আচরণ করেছেন। পিঁপড়ের সঙ্কটাপন্ন জীবনের আর্তিকে কবি মানুষের বিপর্যয় বোধে উন্নীত করেছেন। সেইসাথে কবি পিঁপড়েকে ডাঙায় তুলে আনার ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন। যেখানে বিপদাপন্নের পাশে আশ্রয় হবার মানবতা প্রকাশ করেন–

আপনারা সবাই জানেন। এখানে বক্তৃতা আমার উদ্দেশ্য

নয়। আমি এক নগন্য মানুষ, আমি

শুধু বলি; জলে প'ড়ে যাওয়া ঐ পিপঁড়েটাকে ডাঙায় তুলে দিন।

(শ.ক, ৪/৪-আপনারা জানেন, পৃ: ১৮)

কবি কৈশোরের অবুঝ হত্যাকান্ডের স্মৃতি রোমন্থন করে আহত হন। তাই কবি বোধের পরিপক্কতায় অসহায়ের পাশে সহায় হয়ে মানবতাবোধের পরিস্ফূটন ঘটান তাঁর কবিতায়–

বহুবার আমি বাল্যকালে ফড়িংয়ের ডানা ছিঁড়ে

ছেড়ে দিয়েছি ফুটবল খেলায় মাঠে।

ঘাসের মধ্যে ফড়িংটা লাফিয়ে লাফিয়ে হেঁটে গেছে

এখন যদিও আমি পিপঁড়েদের/ পক্ষ অবলম্বন করছি।

ক্রাচে ভর দেয়া আহত সৈনিকের / মতো তার ভবিতব্যের দিকে।...

(শ.ক, /৫/২১-হত্যার স্মৃতি -পৃ: ৪৩)

কবি চিকন বটিতে কেটে ফেলা একটি মাছের জীবনাবসনে রক্তাক্ত হয়ে যাওয়া বেদনার্ত হৃদয়ের আর্তি প্রকাশ করেন' কোনো ক্রন্দন তৈরী হয় না' কবিতায়। এ কবিতায় কবি মাছের জীবননাশের মধ্যদিয়ে নিষ্পেষিত আত্মার প্রতি মমত্ব প্রকাশ করেছেন। যার কাব্যিক প্রকাশ–

একটি মাছের অবসান ঘটে চিকন বটিতে /
রাত্রির উঠোনে তার আঁশ জ্যোৎস্নারা মতো
হেলায় ফেলার পড়ে থাকে। /...
কোথাও কোনো ক্রন্দন তৈরি হয় না,
কোথাও কোনো ক্রন্দন তৈরি হয় না।
(শ.ক, ৩/১৫-কোনো ক্রন্দন তৈরি হয় না, পৃ: ১৩৬)

শহীদ কাদরী অসহায় পতিতাদের আনন্দদানের মহৎকথা আলোকিত গনিকাবৃন্দের 'রুগ্ন গোলাপদল শীতল' অভিধায় সম্মাননা দিয়ে মানবিক বোধের উন্নয়ন করেন। কবি পতিতাবৃত্তিকে হেয় দৃষ্টিতে নয়, সম্মানপূর্বক মানবিকতার সেবারূপে, অসহায়ের সহায়রূপে প্রকাশ করেছেন –

শহরের ভেতরে কোথাও হেরুগ্ন গোলাপদল ,
শীতল, কালো, ময়লা সৌরভের প্রিয়তমা,
অস্পৃশ্য বাগানের ভাঙাচোরা অনিদ্র চোখের অপ্সরা ,...
অচির মুহূর্তের ঘরে তোমরাই তো উজ্জ্বল ঘরনী।
(শ.ক, ১/২৬-আলোকিত গণিকাবৃন্দ, পৃ: ৪৭)

'নর্তকী' কবিতায়ও কবি জীবনসত্যে মানবতাবাদ প্রকাশ করেছেন। শহীদ কাদরী প্রকৃতি ও প্রাণীকুলের স্পর্শকাতর বিষয়ের প্রতিও মানবতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি আরোপ করেছন –যার প্রকাশ 'এক চমৎকার রাত্রে' কবিতায় দৃশ্যমান–

বেচারা গোলাপ/ মরা একটা পাখির মতো কুঁকড়ে এ্যাত্তোটুকুন হয়ে গেল
তোমার ত্বকের তাপ/ সহ্য করতে পারেনি ঐ নিটোল পুষ্পখন্ড
বুঝেছে মঈন?
(শ.ক, ৩/২১-এক চমৎকার রাত্রে, পৃ: ১৪৫)

জননী - জন্মভূমিস্ব স্বর্গাদপী গরিয়সী। মা -মাটি ও দেশকে কবি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন। যা তাঁর সৃজনশীল কবিতার শব্দমালায় প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর স্বদেশের প্রতি প্রেমবোধকে মানবিকতার দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকাশ করেন। 'নিষিদ্ধ জার্নাল থেকে' কবিতায় কবি 'স্বদেশ মুক্তকারী সত্তাকে' বিকলাঙ্গ ভায়োলিন তথা-
সমস্ত বাংলাদেশ অভিধায় প্রকাশ করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ–

ভোরের আলো এসে পড়েছে ধ্বংসস্তূপের ওপর।

রেস্তোরাঁ থেকে যে ছেলেটা রোজ /
প্রাতঃরাশ সাজিয়ে দিতো আমার টেবিলে/
তে রাস্তার মোড়ে তোকে দেখলাম শুয়ে আছে রক্তাপ্লুত /শার্ট প'রে
ধ্বংসস্তূপের পাশে, ভোরের আলোয়
একটা বিকলাঙ্গ ভায়োলিনের মতো দেখলাম তে' রাস্তার মোড়ে ...
সমস্ত বাংলাদেশ পড়ে আছে আর সেই কিশোর যে তাকে
ইচ্ছের ছড় দিয়ে নিজের মতো করে বাজাবে বলে
বেড়ে উঠছিলো।
(শ.ক, ২/১২-নিষিদ্ধ জার্নাল থেকে, পৃ: ৮২)

শহীদ কাদরী স্বদেশ ও মাতৃভাষাকে মুক্ত করতে আত্মাহুতি দেওয়া প্রাণের প্রতি তাঁর বিনম্র মানবতার কথা বলেছেন। যা তাঁর 'একুশের স্বীকারোক্তি' কবিতায় প্রকাশিত-

অর্থাৎ যখনই চীৎকার করি/দেখি, আমারই কণ্ঠ থেকে
অনবরত/করে পড়ছে অ,আ, ক, খ...
অথচ নিশ্চিত জানি/আমার আবাল্য চেনা ভূগোলের পরপারে
অন্য সব সমৃদ্ধতর শহর রয়েছে,
রয়েছে অজানা লাবণ্যভরা তৃণের বিস্তার।
(শ.ক,২/২৮-একুশের স্বীকারোক্তি-পৃ: ১০৬)

ঈশ্বরবোধ

ঈশ্বর, সময় ও মৃত্যুচেতনা পারস্পরিক হয়ে প্রবাহিত। সত্য, সুন্দর, কল্যাণ, পবিত্র যা মূলত ধর্মের মূল তথা ঈশ্বর চেতনা, যা কবিদের ব্যক্তিগত দর্শনের সঙ্গেই কেন্দ্রিভূত থাকে। অস্তিত্বচেতনায় ঈশ্বর পরিত্যক্ত –

> The silence is God, The absence is God, God is the loneliness of man, There was no one but myself; I alone decided on evil and I alone invented God- If God exists man is nothing. if man exists God does not exist. (বায়তুল্লাহ্ কাদেরী,প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৮)

সুতরাং ঈশ্বর কোনো সারধর্ম (essence) নয়, বরং বোদলেয়ারবাহিত চেতনায় ঈশ্বর পরাভূত, শয়তানের সঙ্গে দ্বন্দ্বরত।

১। দেখেছি প্রখ্যাত ক্ষেত, নষ্টফল, নক্ষত্রের মতো

দ্রাক্ষা, ইক্ষু, গম, সূর্যে আর জ্যোৎস্না আর
ফাঁকা তাঁবু, ঈশ্বরের উজ্জ্বল নীলিমা-/... শয়তানের ধবল মুখ।
(শ.ক, ১/১৪ নিরুদ্দেশ যাত্রা, পৃ: ৩০)

এলিয়েট আক্রান্ত কবি শহীদ কাদরী অনেকটা জীবনানন্দীয় ভঙ্গিতেই যুগের অবক্ষয় ও যন্ত্রণাকে প্রত্যক্ষ করেন। কবি ঈশ্বরের নীলিমা থেকে ধীরে ধীরে শয়তানের দিকেই দৃষ্টি ফেরান। ষাটের দশকের কবিদের দর্শনচিন্তায় আধ্যাত্মিক মোড়কে ঈশ্বরকে দেখা যায় না। কঠিন নিরস্তিত্ব চেতনায় ঈশ্বর ছলচাতুরীময়। স্বর্গলাভের বদলে কবি নারকীয় তান্ডব ও অগ্নিতে দগ্ধ হবার মানসিক উপলব্ধি প্রকাশ করেন-

হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকি নিজের বিবরে
জীবনের নাম শুনে থুতু ছুড়ে নরক! নরক!
অনেকেই বলে গ্যালো,আমি শুধু বলি
নরক তো পিতার শিশ্ন,মায়ের জরায়ু নরকেই পেতে চাই দীর্ঘ পরমায়ু॥
(শ.ক, ৩/১৮ চাই দীর্ঘ পরমায়ু, পৃ: ১৪১)

তাঁদের অনিবার্য নিয়তির মতই নরক প্রিয়তা আসলে অস্তিত্বহীন জীবনের প্রতি আকৃষ্টতার প্রকাশ, প্রচলিত বিশ্বাস, ধর্মবোধ, উর্ধ্বচারী রোমান্টিক প্রেম তাদের মুক্তি লাভের সহায়ক নয়। ঈশ্বরবিহীন তীব্র অস্তিত্বচেতনায় তাঁরা ধরণীর শয়তানরূপে নিজেকে প্রতীকায়িত করেছে। সেই সাথে 'স্বতন্ত্র শতকে' কবিতায় ও মানবিকতাশূন্য সমকালে কবি মানবিক হয়ে ওঠার আমন্ত্রণ জানান।

সময়চেতনা

কালের নির্মমতাকে ধারণ করে শহীদ কাদরী নিজেকে পাপসন্তানের সূচকে প্রকাশ করেছেন। সময় তার আপন গতিতেই বয়ে চলে। তাই কবি অশুভ সময়ের পঙ্কিলতাকে প্রাত্যহিকতার জীবনচিত্রে তুলে আনেন। একইসাথে পরাবাস্তবতার অন্তচাপকে আক্ষেপ, হতাশ ও অপরাধবোধে চিহ্নিত করে কবি গতিময় জীবনের কথা তাঁর কবিতায় তুলে আনেন–

যাকে অসময় বলতে পারো দুঃসময় বলতে পারো
পৃথিবীব্যাপী এখন শুধু/ পাতা ঝরার শীতার্ত গান ছাড়া
অন্য কোন ধ্বনি নেই।...
অথচ সমস্ত পৃথিবীর ঝরা পাতাদের চিৎকার ছাপিয়ে
কবি তার উত্থানের গানটি গাইবে /

অসময় বলো, দুঃসময় বলো/গান থামবে না।

(শ.ক, ৫/২-এখন সেই সময়, পৃ:১ ৪)

সময়ই সবচেয়ে বড় চিকিৎসক। এই উপলব্ধিকে সময়ের অভিধা কবি তুলে এনেছেন 'নাবিক' কবিতায়। এ কবিতায় সময়ের আবর্তনের মেঘ তুল্য সময়ের সাদা সিড়িতে পবিত্র হয়ে উঠার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন।

সময়ের নির্জন শাদা সিড়ি / ধুয়ে দিয়ে ধুপধুনো উন্মনা

সৌরভ মেঘে মিশে, যে হৃদয়/ স্থির হলো তীর্থের জলে।

..../একাকার হলো শেষে তীর্থের পবিত্র জলে।

(শ.ক,৫/৮-নাবিক,পৃ:২৪)

সেইসাথে কবি জীবনে যান্ত্রিক কর্মের নিষ্পেষণ ও সময়ফ্রেমে আটকে যাওয়া বন্দিত্বের দীর্ঘ কাল ক্ষেপণের প্রতি আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন–

জীবনের ঢের উজ্জ্বল দিন, মায়াবী বিকেল

কবর দিয়েছি ব্যর্থতা আর ক্লান্তির ঘামে,

কুমারীর কালো চুলের মতল অঢেল

সময় বন্দী হয়েছে দশটা-পাঁচটা কর্মের ঘামে।

(শ.ক, জল কন্যার জন্য, পৃ:২৫)

মৃত্যুচেতনা

জন্ম মৃত্যু পৃথিবীর এক অবধাবিত জীবন চক্র। এ প্রসঙ্গে শহীদ কাদরী ইকবাল হাসানে সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন –

মানুষের প্রবণতা হচ্ছে যা কিছু ভয়ংকর তাকে সহনীয় করে তোলা। মৃত্যু যে অমোঘ এক নিয়তি। তাকে আমরা রোমান্টিক করে তুলি যাতে সে সহনীয় হয়ে ওঠে। (শহীদ কাদরীর স্মারক গ্রন্থ, পৃ: ৯৬)

প্রবাস জীবন মানেই নির্বাসন। মৃতের পোশাক পড়ে বেঁচে থাকা। এই মৃত্যুচেতনা কবির 'অপেক্ষা করছি' কবিতায় পরিলক্ষিত হয়। এ কবিতায় কবি সব বিচ্ছেদের মধ্যেই মৃত্যুর স্বাদ উপলব্ধি করেছেন। মূলত মৃত্যু এসেছে কবির জীবন্মৃত সময়ের চেতনাতেই। অস্তিত্বসঙ্কট, বিচ্ছিন্নতাবোধ, অপরাধ বোধজনিত আত্মবিধ্বংসীপ্রবণতা, প্রতিষ্ঠান বিরোধী মনোভাব ও নেতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে কবির মৃত্যু-চেতনায় লক্ষ্য করা যায়। যার কাব্যরূপ প্রকাশ

ঘোর লাগা অন্ধকারে মানুষ মৃত্যুর দিকে যাবে

হরিণের মাংস যায় মানুষের উদরে অমোঘ

লাল গোলাপের মতো মৃদু খুঁদ খুটে খাওয়া ওই
মোরগের দিকে ছুরির হাতে, বিকেল এগিয়ে গেলে তুমি
এই দৃশ্য: মৃত্যুর পাঞ্জল শিল্প, প্রকাশ্য বানানো।
(শ.ক, ৩/১৪ মৃত্যুর প্রাঞ্জল শিল্প, পৃ: ১৩৫)

কবির মৃত্যুচেতনা প্রকট হয়ে উঠেছে অস্তিত্বচেতনা সূত্রে। আসলে সমাজ ও রাষ্ট্রে, অভ্যন্তরীণ অনিশ্চয়তার যে সকল অনিবার্য পরিবেশ ও পরিস্থিতি কবিদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে সংশয়, নেতি ও বিপ্রতীপ চেতনার সেটিই তাদের কবিতায় দার্শনিক অভিজ্ঞানে ভাষারূপ পেয়েছে। মূলত মৃত্যুচেতনা জীবন অস্তিত্বের শূন্যতারই ছবি তুলে ধরে। কবির তৃতীয় কাব্য *'কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই'* তে মৃত্যুচেতনা পরিলক্ষিত হয়।

কবরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে প্রথম বসন্তের হাওয়া
মৃতের চোখের কোটরেরর মধ্যে লাল ঠোঁট নিঃশব্দে
ডুবিয়ে বসে আছে/একটা সবুজ টিয়ে।
(শ.ক,৩/১৫ কোনো ক্রন্দন তৈরি হয় না, পৃ: ১৩৬)

'একটি মরা শালিক' কবিতায় কবি রংহীন জীবনোপলব্ধিতে মৃত্যু চেতনাকে উৎসারিত করেন। যা কবির ভাষায়-

তারপর সারাদিন সেই মরা শালিকটা /ঘুরে বেড়ালো আমার সঙ্গে সঙ্গে
একটা মরা শালিক/আমার ওপর এমন দারুণ আধিপত্য
বিস্তার করবে কেন? এই বিবর্ণ হলুদ আমার অভিভাবক
হয়ে উঠবে কেন? আমি তো মৃতের উল্টে যাওয়া/ চোখের সাদা অসংখ্যাবার দেখেছি।
(শ.ক, ৩/৫ একটি মরা শালিক, পৃ: ১২১)

মূলত অস্তিত্ব সঙ্কটের সূত্রেই নৈঃসঙ্গবোধ, অবক্ষয়চেতনা, ঈশ্বর, মৃত্যু, সময়চেতনা নিগূঢ় উপলব্ধি উদঘাটিত হয়ে মৃত্যু পরবর্তী ভয়ানক দৃশ্যে পরিলক্ষিত হয়। যা কবির কবিতায় প্রকাশিত–

আমার কবরে আমি জ্বলন্ত শেয়াল
সন্তর্পনে নাকে শুঁকে রাত্রির নিঃশব্দ মখমলে
আমার টাটকা শব ফেরে যেন আমারই দখলে
বিঘ্নহীন, রক্তমাংস হাড়গোড় চেটেপুটে সবই খাওয়া হয়
নিজেই বাঁচতে যেন পারি ওহে, নিজেদের নেহাৎ ব্যক্তিগত অপচয় ॥
(শ.ক, ১/৬ মৃত্যুর পরে, পৃ:২০)

শহীদ কাদরী মানব জন্মের দেহঘড়ির মাঝে প্রাণকে 'গায়ক পক্ষী' বলে অভিহিত করেছেন। মানুষ জন্ম নিলে তার মৃত্যু অবধারিত বিধি। এই অস্তিত্ব সঙ্কটে গায়ক পাখি স্তব্ধ হলে দেহঘড়ি আর চলে না। যা 'মৃত্যু' কবিতায় কবি প্রকাশ করেছেন এভাবে–

আমাদের প্রত্যেকের মাংসের গভীরে/বসবাস করেন/
একজন গায়ক পক্ষী/একদিন
হঠাৎ বাতাসে/উড্ডীন হয়ে /কোথায় যেন চলে যান/সম্ভবত অন্য কোনো
সতেজ বৃক্ষের ডালে, আমাদের মৃত্যু হয়।
(শ.ক, ৫/২২-মৃত্যু, পৃ:৪৪)

শহীদ কাদরী জীবন জয়ের দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। যা তার অকাল প্রয়াত তরুণ কবি পাথর খন্ডের রূপ জীবনের প্রতিবাদে এক তরুণ কবি পাথর খন্ডে রূপ জীবনের প্রতিবাদে এক তরু পাথরখন্ড চাপা পরিত্রাণকামী সজল উদ্ভিদ রূপে 'আবুল হাসান একটি উদ্ভিদের নাম' প্রকাশ করেন। যার ধ্বনিত সুর 'উত্থান' কবিতাতেও লক্ষ্যণীয়। এখানে কালো গভীর খাদের পাশে ক্রিয়াশীল সফেদ তথা সাদা খরগোশ হয়ে ওঠে মৃত্যুময় কিন্তু মৃত্যুত্তীর্ণ জীবনের প্রতীক। এই ব্যঞ্জনার অগ্রগামী ব্যঞ্জনা সঙ্গতি কবিতারও লক্ষ্যণীয়। (ইকবাল হাসান,শহীদ কাদরী কবি ও কবিতা,২০০৩ পৃ: ২৩+৩০) তাছাড়া মৃত্যুচেতনার মধ্য দিয়ে কবি জীবনের শেষকে নয় অনন্ত জীবনের গতির উপলব্ধিকেও প্রকাশ করেছেন,যা তাঁর 'এক চমৎকার রাত্রে' কবিতায় প্রকাশিত–

মানুষের মহৎ মৃত্যুর পর/মহত্তর অস্ত্রগুলো থেকে যায়,
অসংখ্য গোলাপকুঞ্জ ঝলসে গেল–কোথাও সুগন্ধ কোনো
লীন হ'য়ে নেই; আমাদের অন্যমনস্কতা টের পেয়ে
অন্তত একটি টিয়ে বারান্দার কঠিন মেঝেয়/ট'লে পড়ে গেছে
তার সবুজাভা এই চরাচরে কখনো দেখি না
কিন্তু অর্থশাস্ত্র-বিষয়ক কৌটিল্যের চিন্তাগুলো
বুড়ো বটের মতো প্রায় অবিনশ্বর হ'য়ে আছে।
(শ.ক, ৩/২১-এক চমৎকার রাত্রে, পৃ:১৪৬)

শহীদ কাদরী জীবনকে নানা প্রান্ত থেকে দেখেছেন এবং দর্শনচেতনায় যুদ্ধকালীন জীবনকে ইতিবাচকতায় অবিনশ্বর বটের মতো হয়ে উঠার প্রত্যাশা রেখেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সমাজ ও রাজনীতি

প্রথিত যশা কবি শহীদ কাদরী ষাটের দশকের অন্যতম কবি। ত্রিকালদর্শী, বিজ্ঞানমনস্ক, অনুসন্ধিৎসু এ কবির উন্মেষকালে একদিকে ছিল ধনতন্ত্রের আগমন অন্যদিকে ছিল পুরানো জামিদারী প্রথার অবক্ষয়। এছাড়া দুটো বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে হনন মত্ত পৃথিবী, বিরুদ্ধ অস্থিতিশীল ও অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজ সঙ্কট কবি চেতনাকে সমাজ ও রাজনীতির নিপুণ রূপাঙ্কনে বিশ্বজনীনতায় ধাবিত করে। (শালুক পৃ: ৩৭৭/ কালিকলম-(প্রবন্ধ)মাহবুব সাদিক পৃ: ১৩)

কবি সমকালীন সমাজ ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে অগ্রজে অবিশ্বাস, প্রচলিত জীবনাদর্শের প্রতি অনাস্থা, মারাত্মক আত্মবিভ্রমে নিপতিত কবিচৈতন্যের ভোগবাদ ও পুজিবাদের বিরুদ্ধাচারণ প্রকাশ করেন তাঁর কবিতায় –

সহসা সন্ত্রাস ছুঁলো। ঘর-ফেরা রঙিন সন্ধ্যার ভীড়ে
যারা ছিল তন্ত্রালস দিগ্বিদিক ছুটলো, চৌদিকে
ঝাঁকে ঝাঁকে লাল আরশোলার মত যেনবা মড়কে
রাজত্ব রাজত্ব শুধু আজ রাতে, রাজপথে- পথে /বাউন্ডুলে আর লক্ষ্মীছাড়াদের, উন্মুল, উদ্বাস্তু
বালকের, আজীবন ভিক্ষুকের, চোর আর অর্ধ-উন্মাদের
বৃষ্টিতে রাজত্ব আজ। রাজস্ব আদার করে যারা,
চিরকাল গুণে নিয়ে যায়, তারা সব অসহায়/পালিয়েছে ভয়ে।
(শ.ক, ১/১-বৃষ্টি বৃষ্টি, পৃ:১১)

এ কবিতাটি তিরিশ ও চল্লিশের তীব্র রজনীতি সচেতনতার ঢেউয়ের অন্তরতম ছবি হয়ে প্রকাশিত। কবি স্বপ্নের ভেতর হলেও বৃষ্টিতে নিমজ্জিত শহরের বাউন্ডুলে আর লক্ষ্মীছাড়াদের উন্মুল- উদ্বাস্তুদের হাতে স্বায়ত্তশাসনসহ সমস্ত রাজত্ব তুলে দেন- যা বুর্জোয়া সভ্যতাকে একটি অবিশ্বাস্য স্বতঃস্ফূর্ত শক্তি দিয়ে ধ্বংস করে দিয়ে যাবে। কারণ ক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতি ও সমরপ্রিয় নেতৃবৃন্দ ধ্বংস করে দিচ্ছে মানুষের মানবিক মূল্যবোধ। যার প্রতিধ্বনিত রূপ তাঁর কবিতায় প্রকাশিত-

পরিত্যক্ত মূল্যবোধ, নতুন ফুলের কৌটাগুলো
জ্বলজ্বলে মনির মতন সংখ্যাহীন জ্যোৎস্না/ ভরে নিয়ে
নিঃশব্দে থাকবে ফুটে মধ্য বিশ শতকের ক্লান্ত /শিল্পের দিকে চেয়ে/...
বসে আছি আজ রাত্রে বারান্দার হাতল চেয়ারে /জ্যোৎস্নায় হাওয়ায়।
(শ.ক, ১/৫-নশ্বর জ্যোৎস্নায়, -পৃ: ১৯)

সাতচল্লিশের দেশবিভাগের পর কলকাতার জন্ম নেত্তয়া শহীদ কাদরীকে পিতার মৃত্যুর পর ঢাকায় চলে আসতে হয়। তখন পাকিস্তানি শাসনামলের আইউবি কালো দশকের প্রভাব, বিভাগোত্তর স্বপ্নভঙ্গের অনিবার্য পরিণাম, রাজনীতির চোরাগোপ্তা বিচরণ ও বিচিত্র কলুষ কবিকে প্রচলিত জীবন অভিপ্রায় থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। যার কারণে সমকালীন সমাজ ও রাজনীতির প্রেক্ষিতে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর কবিতায় প্রকাশিত–

(বায়তুল্লাহ্ কাদেরী, প্রাগুপ্ত, ৮৭ পৃ:)

আমার বিকট চুলে দুঃস্বপ্নের বাসা? সবার আত্মার পাপ
আমার দু'চোখে শুধু পুঞ্জ পুঞ্জ কালিমার /মতো লেগে আছে?
জানি, এক বিবর্ণ গোষ্ঠীর গোধূলির শেষ /বংশজাত আমি, /
বস্তুতই নপুংসক, অন্ধ কিন্তু সত্যসন্ধ দুরন্ত সন্তান।
(শ.ক.১/২-নপুংসক সন্তের উক্তি, পৃ: ১৪)

একই ভাবে তৎকালীন রাজনীতির সংবেদনহীন নিষ্ঠুর চাল কবি তার সমকালীন সমাজ ও রাজনীতির প্রেক্ষাপটে জাতিগত দাঙ্গায় মানবহত্যার চিত্র তুলে এনেছেন। তার ধ্বনিত প্রকাশ-

রক্তপাতে, আর্তনাদে, হঠাৎ হত্যায় চঞ্চল / কৈশোর কাল
শেখালে মারণ - মন্ত্র, আমার প্রথম পাঠ কী করে /যে ভুলি,
গোলাপ বাগান জুড়ে রক্তে মাংসে পচে ছিল/একটি রাঙ্গা বৌ।
ক-খানা ছকের গুটি মানুষের কথামতো মেতেছিল / বলে।
(শ.ক, ১/৮-উত্তরাধিকার, পৃ: ২২)

সমকালীন সমাজ ও রাজনীতির করাল গ্রাসে মানুষের মারণাস্ত্রের তাপে পৃথিবীতে অসংখ্য গোলাপকুঞ্জ ঝলছে গেছে। কাদরী লিখেছেন-

পৃথিবীর সাধারণ মানুষ বা কবিরা মরে গেলেও পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হবে না-কিন্তু যুদ্ধবাজ রাজনৈতিক নেতা এবং বিধ্বংসী অস্ত্রের জোগানদাতারা না থাকলেই বরং উপকার হবে পৃথিবীর। (কালিকলম, পৃ: ১৩)

এ প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে স্মরণযোগ্য কবিতা ' রাষ্ট্র মানেই লেফ্ট রাইট লেফ্ট ' এবং 'স্কিৎসোফ্রেনিয়া'। 'রাষ্ট্র মানেই লেফ্ট রাইট লেফ্ট' কবিতায় কবি এ কালের রাষ্ট্রব্যবস্থার কাজকর্মের একটি সরল তালিকা তৈরি করেছেন। তাঁর কাছে রাষ্ট্র মানেই সাঁজোয়া বাহিনী, ধাবমান পুলিশ, কাঠগড়া ও জেলের গরাদ।ব্যক্তি সেখানে তুচ্ছ – নাম পরিচয়হীন ধূলিকণার মতো। এ কালের রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যক্তির স্থান নেই। রাষ্ট্র মানেই মন্ত্রী, রাজবন্দি, গুম ও হত্যা। বিরুদ্ধমত ও পথের মানুষকে প্রতিনিয়ত পিষ্ঠ করে রাষ্ট্রযন্ত্র। এ প্রসঙ্গে দাউদ হায়দার বলেছেন-

শহীদ কাদরী বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। কাদরী সহজ ভাষায় তীক্ষ্ণ আঘাত হেনেছেন শোষণের মর্মমূলে। (শহীদ কাদরী যৌথ খামার'- সাপ্তাহিক প্রকাশনা, একতা।)

এই কারণে শহীদ কাদরী সমকালীন বাস্তবতার প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার ছবি এঁকেছেন তাঁর কবিতায় । কবি '-রাষ্ট্র মানেই লেফট্ রাইট, লেফ্ট রাইট, লেফ্ট' কবিতায় সামরিক শাসনের স্বৈরাচারী রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন এবং বিপর্যস্ত জনজীবনকে রাষ্ট্রযন্ত্রে ব্যর্থতার ফসল বলে উল্লেখ করেছেন। যার উপস্থাপিত কাব্যরূপ–

রাষ্ট্র মানেই স্ট্রাইক, মহিলা বন্ধুর সঙ্গে /এনগেজমেন্ট বাতিল,
রাষ্ট্র মানেই পররাষ্ট্র নীতি সংক্রান্ত /ব্যর্থ সেমিনার /রাষ্ট্র মানেই নিহত সৈনিকের স্ত্রী/
রাষ্ট্র মানেই ক্রাচে ভর দিয়ে হেঁটে যাত্তয়া /
রাষ্ট্র মানেই রাষ্ট্রসংঘের ব্যর্থতা/রাষ্ট্রসংঘের ব্যর্থতা মানেই
লেফট্ রাইট, লেফ্ট রাইট, লেফ্ট্–।
(শ.ক, ২/১-রাষ্ট্র মানেইলেফট্ রাইট, লেফ্ট রাইট, লেফ্ট্, পৃ:৬৫)

অর্থাৎ অত্যাচার পীড়ন- ব্যর্থতা, সামরিক শাসন, ঔপনিবেশিক শাসনের চরিত্র এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রসংঘের ব্যর্থতার ফল যে সামরিক শাসন, যা উপর্যুক্ত কবিতার অন্তর্গত ভাবনা। রাষ্ট্রযন্ত্রের কূটকৌশল আরও বেশি শিল্পোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে 'স্কিৎসোফ্রেনিয়া 'কবিতাটিতে । এখানে আধুনিক বিশ্বব্যবস্থাই যেন- স্কিৎসোফ্রেনিক। অসংগতি আর বিভক্ত ব্যক্তিত্ব ও মানসিক রোগাক্রান্ত যুদ্ধ বাজ সমরনায়কদের পৃথিবী এটি। এখানে ব্যক্তি অসহায়, এরই অন্তরভেদী উচ্চারণ–

পেটের ভেতর যেন গর্জে উঠছে গ্রেনেড /কার্বাইনের নলের মতো হলুদ গন্ধক- ঠাসা- শিরা,
গুনাগার হৃদয়ের মধ্যে ছদ্মবেশী গেরিলারা /খনন করছে গর্ত, ফাঁদ, দীর্ঘ কাঁটা বেড়া
জানু বেয়ে উঠেছে একরোখা ট্যাঙ্কের কাতার, /রক্তের ভেতর সাঁকো বেঁধে পাড় হলো/
বিধ্বস্ত গোলন্দাজেরা/ প্রতারক কটা রঙহীন সাবমেরিনের সারি
মগজের মধ্যে ডুবে আছে, / সংবাদপত্রের শেষ পৃষ্ঠা থেকে বেরিয়ে এসেছে
এক দীর্ঘ সাঁজোয়া বাহিনী /এবং হেডলাইটগুলো অনবরত বাজিয়ে চলেছে সাইরেন।
(শ.ক, ২/৫ স্কিৎসোফ্রেনিয়া পৃ: ৭৩)

এ এক সামগ্রিক যুদ্ধচিত্র। কবিতা শেষের প্রাত্যহিক ভোজনোৎসব হচ্ছে যুদ্ধরাজ সভ্যতার হত্যা আর রক্তপাতের ভোজনোৎসব। যেখানে যুদ্ধবাজ নেতার প্রতীক বাচাল বাবুর্চির তত্ত্বাবধানে প্রতিনিয়ত রান্না হচ্ছে নানা ধরনের মানব মাংস–নাইজেরিয়ার, আমেরিকার, সায়গলের, বাংলার কালো, সাদা এবং ব্রাউন মাংস। বিশ্বব্যাপী সামরিক

বাহিনীর আগ্রাসন এবং হত্যা ও রক্তপাতের বিরুদ্ধে শহীদ কাদরীর বিখ্যাত প্রতীকী কবিতা ' তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা' যুদ্ধবিরোধী মনোভাবকে তিনি তুলে এনেছেন এ কবিতার ফ্যান্টাসির মাধ্যমে –

ভয় নেই, আমি এমন ব্যবস্থা করবো /বন বাদাড় ডিঙিয়ে
কাঁটা- তার , ব্যারিকেড পার হয়ে। অনেক রণাঙ্গনের/ স্মৃতি নিয়ে
আর্মাড কারগুলো এসে দাঁড়াবে/ ভায়োলিন বোঝাই ক'রে
কেবল তোমার দোরগোড়ায় প্রিয়তমা।
(শ.ক,২/৩১- তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা- পৃ: ১১১)

প্রিয়তমা স্বদেশ মাতৃকার প্রতি ভালবাসা নিবেদন করতে যেয়ে কবি আসলে সামরিক বাহিনীহীন হত্যা ও রক্তপাতহীন এক মানবিক বিশ্বের চিত্রই আঁকতে চান। বলা বাহুল্য 'গোলাপ' কোনো কোনো কবিতায় তাঁর প্রত্যাশার সব ক্রন্দন ছড়িয়ে হয়ে উঠেছে, মানুষের চির আকাঙ্ক্ষার রাজনীতি। শিল্পমাত্রই অন্তগর্ত বিষাদের ভারে জর্জরিত, বিকশিত এবং বিশ্বজনীনতায় অন্বিষ্ট, শহীদ কাদরী জীবনের বহুমাত্রিক রূপ প্রকাশে মনন ও সর্বজনীন বোধের সমন্বয়ে স্বদেশপ্রীতিকে সম্পৃক্ত করেন। তিনি তিরিশের আধুনিক কবিদের উওরসূরি। সেইসাথে বোদলেয়ারীয় প্রভাব কবির মধ্যে প্রত্যক্ষ হলেও কবির নিজস্বতার রয়েছে বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য। রোমান্টিক বোহেমিয়ান কবি সমকালীন বিচ্ছিন্নতা, অসহায়ত্ব ও একাকিত্বে ছবি এঁকেছেন সমাজ ও দেশকে নিয়েই। নিরবলম্ব কবি তাঁর নিরাশ্রয় ও নিঃসঙ্গতাকে সঙ্গী করে মুক্তির আশ্বাস খুজেছেন 'বৃষ্টি বৃষ্টি' কবিতায়-

এইক্ষণে আঁধার শহরে প্রভু, বর্ষায়। বিদ্যুতে /নগ্নপায়ে ছেঁড়া পাৎলুনে একাকী
হাওয়ায় পালের মতো শার্টের ভেতরে /ঝকঝকে , সদ্য, নতুন নৌকোর মতো একমাত্র আমি,
.../কোন আগ্রহে সম্পন্ন হয়ে, কোন শহরের দিকে
জলের আহ্লাদে আমি একা ভেসে যাব?
(শ.ক, প্রাগুক্ত, বৃষ্টি বৃষ্টি-পৃ: ১৩)

প্রথামাধি শহীদ কাদরীর কবিতা রাজনীতি চিন্তিত। কাদরীর কবিতার রাজনীতির পটে ব্যক্তির আত্মমুক্তিরই প্রধান দ্রষ্টব্য, আত্মদৃষ্টি প্রসারী কাব্য ভাষার বিশিষ্টতায় কবি বহু কবিতায় সমাজ ও রাজনীতির বলয়ে স্বদেশপ্রীতিকে প্রকাশ করেন । যেমন- 'কবিতা অক্ষম অস্ত্র আমার', নিষিদ্ধ জার্নাল থেকে , পাখিরা সিগন্যাল দেয়, ব্লাক আর্ডটের পূর্ণিমায়। স্বাধীনতার শহর ইত্যাদি। দেশের প্রতি কবির অকৃত্রিম ভালোবাসা বর্তমান, যে কারণে তিনি বারবার বলেছেন– কোনো নির্বাসনই কাম্য নয়। পরবাসেও তাঁর দৃষ্টি ছিল স্বদেশে দিকে–

আমার মতন ভ্রাম্যমান এক বিহ্বল মানুষ/ ঘরের দিকেই /ফিরতে চাইবে।
(শ.ক, ৪/৩৬ নিরুদ্দেশ যাত্রা, পৃ: ৬২)

দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর অধিবাসী কবি। যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতে অস্থিতিশীল জিজ্ঞাসাতে নিঃসঙ্গতাকে যৌবনের পরম সুহৃদ জেনে কবি সমাজ ও রাজনৈতির অভিজ্ঞতাকে জীবন ঘনিষ্ঠ করে প্রকাশ করেছেন। কবি মুক্তিযুদ্ধকালীন দেশ মাতৃকাকে নিয়ে উপলব্ধির গভীরতম ছবি অঙ্কন করেন ' নিষিদ্ধ জার্নাল থেকে' কবিতায়-

মধ্য দুপুরে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একটা তন্ময় বালক/
কাচ, লোহা, টুকরো ইট, বিদীর্ণ কড়ি কাঠ, একফালি/ টিন
ছেঁড়া চট, জং ধরা পেরেক জড়ো করল এক নিপুণ/ ঐন্দ্রজালিকের মতো যত্নে
এবং অসতর্ক হাতে কারফিউ শুরু হবার আগে/
প্রায় অন্যমনস্কভাবে তৈরি করল কয়েকটা অক্ষর ;
স্বা-ধী-ন-তা। (শ.ক, ২/১২-নিষিদ্ধ জার্নাল থেকে, পৃ:৮২)

স্বদেশ প্রীতির অনন্য দৃষ্টান্ত কিংবদন্তি দক্ষিণ আফ্রিকার বিদ্রোহী কবি বেঞ্জামিন মলোয়িস। তিনি হাসতে হাসতে ফাঁসির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, কারণ সৃশনশীল মানুষেরা কখনো দেশ-জাতি-সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। কবি তাঁর জাতি সত্তার আইডেনটিটি নিয়ত পরিচর্যা করেন। বেঞ্জামিন মলোয়িসের মতো শহীদ কাদরীও তাঁর 'ব্ল্যাক আউটের পূর্ণিমায়' কবিতায় স্বদেশপ্রীতি প্রকাশ করেন। যাতে কবি দেশ মাতৃকাকে আংটির মতো পরিধেয় মূল্যবান অলংকাররূপে ধারণ করে দেশ মাতৃকতার প্রতি আত্মপ্রণয় প্রকাশ করেছেন। সেই সাথে কবি দেশ মুক্তির ছবি রূপায়ণ করতে যেয়ে বাঙালির অসহনীয় যন্ত্রণার চিত্র এঁকেছেন 'কবিতা অক্ষম অস্ত্র আমার' কবিতায়-

স্টেনগান গর্জনের শব্দে পাখিরা ঝাঁকে-ঝাঁকে /উড়ে যায়
বিকলপক্ষ কবিতা আমার তুমি এই জর্নালের মধ্যে,...
স্বাধীনতার সৈনিক যেমন উরুতে স্টেনগান বেঁধে নেয়,/
কিম্বা সন্তর্পণে গ্রেনেড নিয়ে হাঁটে/তেমনি আমিও /.
.../তবু আরো একবার বলি
যদি পারো গর্জে ওঠো ফীল্ডগানের মতো অন্তত/ একবার
(শ.ক, ২/১০-কবিতা অক্ষম অস্ত্র আমার, -পৃ: ৮০)

শহীদ কাদরী স্বাধীনতার অপার মুক্তির স্বাদ 'স্বাধীনতার শহর' কবিতায় বর্ণনা করেন। যাতে প্রাণখুলে বন্ধনহীন মুক্তির বাতাস গ্রহণের কথা বলেছে –

স্বাধীনতা, তুমি কাউকে দিয়েছো সারাদিন/
টো-টো কোম্পানীর উদ্দাম ম্যানেজারী করার সুবিধা
কাউকে দিয়েছো ব্যারিকেউহীন দয়িতার ঘরে যাত্তয়ার /রাস্তা...
আর যখন তখন এক চক্কর ঘুরে আসার/
ব্যক্তিগত, ব্যথিত শহর, স্বাধীনতা।(শ.ক, ২/১৬-স্বাধীনতার শহর'-৮৮পৃ:)

যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে দেশমাতাকে ভালোবেসে অতিবাহিত করতে হয়েছে শঙ্কিত জীবন প্রবাহ। তারই প্রকাশ -

আজ সারাদিন একজোড়া শালিক/ গোয়েন্দা পুলিশে মতো
বাতাস একটা বুনো একরোখা মোষের মতো/
আমাকে ধাওয়া করে বেড়ালো এ প্রান্ত থেকে/ ও প্রান্ত পর্যন্ত।
(শ.ক,৩/১-আজ সারাদিন-পৃ: ১১৬)

সমাজ ও রাজনীতি অঙ্গনে সুবাতাস বয়ে আনার প্রবাহে দেশমুক্তির সাথে ভাষামুক্তিও বিনেসুতায় গাঁথা মালার মত যুক্ত ছিল তাঁর কবিতায়। যা 'একুশের স্বীকারোক্তি' কবিতায় মর্মস্পর্শী হয়ে প্রকাশিত-

অর্থাৎ যখনই চিৎকার করি /দেখি আমার কণ্ঠ থেকে
অনবরত /ঝড়ে পড়ছে অ, আ, ক, খ,।
(শ.ক, ২/২৮-একুশের স্বীকারোক্তি, পৃ: ১০৬)

কিংবা, 'আপনারা জানেন' কবিতাতে ভাষা মুক্তির মুক্তিকামীদের প্রতি কবি সম্মান প্রদর্শন করেন-

আমার মনে আছে ১৯৫২র স্লোগান চঞ্চল একুশের অপরাহ্নে/
শ্বেত কফিন ও স্মৃতির মিনার বলতে চাই।
(শ.ক,৪/৪-'আপনারা জানেন', পৃ: ১৮)

একই সাথে 'প্রবাসের পঙক্তি মালা ' কবিতায়ও মাতৃভাষা তথা মাতৃভূমির প্রতি অনন্ত ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন কবি। যার বহিঃপ্রকাশ এরূপ–

দ্যাখো, দ্যোখো কী চমৎকার একটা চড়ুই /
কী দারুন কিচিরমিচির করছে আজ মার্কিনি ভাষায় এই
মেঘ ভারানত /অন্তহীন দুপুর বেলায়! হে চড়ুই/
আদলে -গঠনে অবিকল তুমি দেখতে বাঙালি/
চড়ুইদের মতন /তোমার মুখে কি মানায় বন্ধু শেতাঙ্গের এই বিবর্ণ
বিদেশী /ভাষা?/বরং এদিকে এসো, তোমাকে শেখাই/অ-আ-ক-খ /
হে চড়ুই বলো, বাংলা বলো।
(শ.ক,৪/২৫-প্রবাসের পঙক্তি মালা-পৃ:৪৬)

শহীদ কাদরী সমাজ ও রাজনীতির সচেতন নাগরিক হিসেবে সবসময় মানবমুক্তির গান গেয়েছেন। তাই সমকালীন সঙ্কটাপন্ন সমাজ ও রাষ্ট্রের শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থার সমাজ ও মানুষের যন্ত্রণা তিনি নিজের মধ্যে ধারণ করেছেন– যার প্রকাশ তার উপস্থাপিত বেশকিছু কবিতায় পরিলক্ষিত হয়। তা নিম্নে উল্লেখ করা হল–

১) দুই মহাযুদ্ধের শোণিতে রাঙ্গা হয়ে আছে/ আমাদের/
নিজস্ব শতক; এবং এখনো ভ্রাতৃরক্তে সিক্ত আমরাও /স্বদেশ,
উপরন্তু রক্তাপ্লুত প্রতিবেশী ভারত এবং পূর্ব ইউরোপসহ
গৃহযুদ্ধ এখন আসন্ন প্রায় সমগ্র প্রাক্তন সোভিয়েত/ প্রাচ্যে।
(শ.ক, ৪/১-স্বতন্ত্র শতকের দিকে, -পৃ: ১৪)

২) কণ্ঠের অন্ধকার থেকে/ উড়ে গেলো কয়েক স্কোয়াড্রন মিগ- ১৭ র ঝাঁক। আর
আমাদের বধির করে মেশিনগান গর্জন করছে বারবার,
এক রত্তি ছোট্ট একটা চাবিঅলা দম-দেয়া ধূসরাভ ট্যাংক
একটা চারাগাছের চতুর্দিকে ঘুরপাক খেতে খেতে
মাড়িয়ে দিলো কয়েকটা ফড়িং, পিঁপড়ে আর
অসংখ্য ঝংকারে ভরা তিনটে নীল ঝিঁঝির শরীর।
(শ.ক, ২/২৫-যুদ্ধোত্তর রবিবার, পৃ:১০১)

৩) সময়টা ছিল যুদ্ধের/ কারফিউ চতুর্দিকে /বোকা , হাবা ও অবুঝদের
দলে মিশে গিয়ে আমরা/ জ্ঞানী বুদ্ধের
বাণীর বদলে বন্দুক/ নিয়েছি নির্দ্বিধায়।
(শ.ক, ৪/২-সেই সময়, পৃ:১৬)

ঔপনিবেশবাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় সুষম ধণবন্টনের সমাজ ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে। 'কাক' নামক কবিতায় কবি নিরন্ন মানুষের অসহায় অবস্থা তুলে এনেছেন। রক্তের বন্যায় স্বজনহারা নিরন্ন মানুষের শোক তথা দুঃখের হাহাকার যেন বিজয় পতাকা হয়ে কাকের মতই সর্বত্র বিচরণ করছে। তারই প্রতিধ্বনিতরূপ–

মনে হয় নিরন্ন মানুষের চিৎকার ঐ পাখিদের /শ্রুতিগোচর হয়েছে।
যেন ওরা টের পেয়ে গেছে কী বিপন্ন আজ /
আমাদের গ্রাম ও নগরগুলো! কী অক্লান্তভাবে/বয়ে চলেছে
স্বজনের রক্তধারা আমাদের চতুর্দিকে।
আর এখন তাই আমাদের আকাশ জুড়ে
উড়ছে অসংখ্য শোকের পতাকার মতো কাক?
(শ.ক, ৪/৩৪-কাক, ৬০পৃ:)

সমকালীন সমাজ ও রাজনীতির মধ্যে নৃশংস ও করাল আগ্রাসন কবিকে ভাবিয়েছে যা তাঁর 'অপেক্ষা করছি' কবিতায়ও প্রকাশিত। বিচ্ছেদের যন্ত্রণা কবি নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। যার জীবন সঞ্জাত অভিজ্ঞতা তার কবিতায় দৃশ্যমান –

ইরাক জ্বলছে। আফগানিস্তানের পাহাড়ে পাহাড়ে /
হন্তারকদের সাব-মেশিনগান /
গর্জন করছে বারবার। আত্মহত্যাকামী /
ব্রেনওয়াশড্ বালকেরা উরুতে গ্রেনেড বেঁধে
ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাদের শহরে। /
ঘন ঘন সাইরেন বাজিয়ে ছুটছে /পুলিশের হলুদ গাড়ি।
টুইন টাওয়ারে যেদিন বিমান আক্রমন হলো /সেদিন তুমি নিউইয়র্কে।
আর গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংয়ের সময় /আমি কলকাতায়। প্রায় আজীবন /
বিচ্ছেদ-ভাবাতুর আমি।
(শ.ক, ৫/৪-অপেক্ষা করছি, -পৃ: ১৮)

কবি রাষ্ট্র বলতে মানুষের জাগরণ বোধে উপনীত প্রকাশকে বোঝেন। আর নিসর্গের প্রতি কবির আকর্ষণ যেন স্বাধীনতারই দান। তাই কবি হত্যাহীন মানবতাবাদী প্রতিরোধের শিল্পীত দৃষ্টির প্রত্যাশা রেখেছেন তার কবিতায়–

আজ আবার উদ্যত ছুরি মানুষের হাতে /
ওর পায়ের নিচে/ পিষ্ট হচ্ছে নারী,/
শিশুরা নিহত হচ্ছে/...
আমাদের চেনা নগরগুলো থেকে /উঠছে ক্রন্দনধ্বনি...
কবি, তুমি জানো আমাদের প্রিয় কবিতায় /অমর পঙক্তিগুলো
হত্যার বিরুদ্ধে চিরকাল– চিরকাল
কবি, ওকে প্রতিহত করো।
(শ.ক, প্রাগুক্ত, মানুষ নতুন শতকে, পৃ: ৩১)

একই সাথে কবি হত্যার খেলা বন্ধ করার তথা মানব মুক্তির ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন । যা তাঁর ' প্রার্থনা করছি আমি উত্থান' কবিতায় প্রকাশিত। এ কবিতায় কবি যুদ্ধবিধ্বস্ত মানুষের হাহাকার প্রকাশ করেছেন এবং এ দুর্বিষহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ চেয়েছেন। যার উচ্চারিতরূপ-

ছুরি-বেঁধা মানুষের চিৎকার/বন্দুকের গুলির শব্দ
ছুররা খাওয়া কাকের আর্তনাদ/কারও ঘর ভেঙে পড়ার
মর্মঘাতী আওয়াজ, দেশে দেশে সৈনিকদের /কুচকাওয়াজ, আর কিছু জাহাঁবাজ

রাজনীতিবিদের উল্লাস ইত্যাদি করাল ধ্বনি /থেকে আমাকে নিস্তার দাও।

(শ.ক, ৫/১৪-প্রার্থনা করছি আমি উত্থান তোমার কণ্ঠস্বরের, পৃ: ৩৪)

কবি পারস্পরিক হানাহানির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। সেইসাথে হরিণসম নিস্পাপ মানুষের উপর হত্যাযজ্ঞকে ধিক্কার দিয়েছেন। আর এ মনোভাবেরই প্রকাশ রয়েছে 'যুদ্ধ' নামক কবিতায়–

তির ধনুক নিয়ে তোমরা বড্ড বাড়াবাড়ি/ করলে হে...

তোমাদের হত্যালিপ্সা হরিণগুলোকে/নিশানা করেছে। আচ্ছা, তোমাদের

কি ক্ষমাঘেন্না বলতে কিছুই নেই, অ্যাঁ? /শেষ পর্যন্ত তোমরা পরস্পরের দিকে

তির-ধনুক বল্লম ছুড়ে ছুড়ে মারছ/ ভয়ে আমার সমস্ত শরীর সেধিয়ে যাচ্ছে।

(শ.ক, ৫/১৬–যুদ্ধ, পৃ: ৩৬)

প্রেম-প্রতিবাদ ও রাষ্ট্রিক অসংলগ্নতার বিরুদ্ধে সত্যোচ্চরণের কবি শহীদ কাদরী। তিনি মাতৃভাষার মুক্তির মধ্যে দিয়ে দেশমুক্তি তথা মানব মুক্তির উল্লাসকে সমাজ ও রাজনীতির প্রেক্ষাপটে অনপুঙ্খভাবে প্রকাশ করছেন –

না! উত্তর জানে না কেউ,/...

গায়ক পক্ষীরাও নিহত হবে শখের শিকারির /অমোঘ নিশানায়

ইতিহাসও নিরুত্তর। কেন নৃপতিরা /সাম্রাজ্য বিস্তার করেন।...

যুদ্ধফেরত স্বাধীনতার /ক্রাচে ভর দেয়া সৈনিকরা লাফিয়ে লাফিয়ে

ফড়িংটাকে হাঁটতে দেখে/ সোল্লাসে তালি /বাজবে,

(শ.ক, ৫/১৯–উত্তর নেই, পৃ:৪০)

সর্বোপরি, আশাবাদী, স্বপ্নচারী কবি শহীদ কাদরী সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক কবিতা উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে চিরকালীন সত্য হিসেবে সভ্যতাকে প্রকৃষ্ট ইতিহাস রূপে অভিহিত করেছেন। যা তিনি তাঁর 'হন্তারকদের প্রতি' কবিতায় আত্মাস্বীকারোক্তি রূপে প্রকাশ করেন–

আমায় স্বপ্নগুলো নতজানু হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে

ধোঁয়া ওড়া বন্দুকের নলের সামনে আহত হরিণশাবকের

মতো থরথর করতে থাকে /সভ্যতায় প্রকৃষ্ট ইতিহাস।

(শ.ক, ৫/২০–হন্তারকের প্রতি, পৃ: ৪২)

তৃতীয় অধ্যায়

প্রকরণ

বহুউচ্চারিত একটি চিরন্তন সত্য তথা অনুভূতির চাপে প্রকাশিত এক রূপময় ভাবশিল্পই হলো কবিতা। কবিতার বহিরঙ্গ বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বৈচিত্র্য গড়ে ওঠে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে। অপরদিকে প্রকরণ তথা গাঠনিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য সূচিত হয় কবিতার শব্দ-ভাষা-অলংকার, চিত্রকল্প -প্রতীক - পুরাণ ও ছন্দ বিন্যাসের মাত্রা নিরূপণে। শহীদ কাদরী তাঁর কাব্য নির্মাণে প্রকরণগত স্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্টতা অর্জন করেন নতুনত্বের মাত্রায়। ষাটের দশকের কবি হিসেবে শহীদ কাদরী কাব্য প্রকরণে কবিতাকে গ্রামীণ নষ্টালজিক চেতনা থেকে ইউরোপীয় নন্দনতত্ত্বের সাথে একাত্ম হন। সেই সাথে অস্তিত্ববাদ, পরাবাস্তববাদ, অভিব্যক্তিবাদ ইত্যাদির মতো শিল্প আন্দোলনও সচেতন কাব্য- অনুষঙ্গরূপে তাঁর কবিতায় স্থান করে নেয়। তাঁর কবিতাতে আত্ম-স্বীকরণমূলক বিবৃতির ঢং, জীবনমুখী শব্দবন্ধ ,আত্মদৃষ্টিপ্রসাদী কাব্যভাষা ও সাম্প্রতিকতম ভাষাভঙ্গি যুক্ত হয়ে প্রকরণ মাত্রাকে দিয়েছে অনন্য উচ্চতা। তাঁর কবিতায় ব্যক্তি তথা সৃষ্টিশীল সত্তা নিজস্ব প্রতীকময়তায় নতুনত্বে উন্নীত হন। শহীদ কাদরীর প্রকরণ বিন্যাসে স্বতন্ত্ররূপে পরিলক্ষিত হয়েছে উপমা- প্রতীক- পুরাণ ও চিত্রকল্পের নির্মাণ কৌশল। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বকবিতার বিভিন্ন অধুনা প্রকরণ তত্ত্বের প্রয়োগ, প্রচল-অপ্রচলন কথ্য ভাষাভঙ্গির ব্যবহার, সমকালীন চলতি ইংরেজি বাক্যবন্ধের মানসিকতায় আত্মজৈবনিক ঢঙে বিবৃতিময় কাব্যভাষাও তিনি ব্যবহার করেছেন। চিত্রকল্প-প্রতীক- নির্মাণে তিনি যেমন ফারসি প্রতীকবাদী কবিদের আদর্শ জ্ঞান করেছেন। তেমনি এলিয়টীয় কাব্যবোধ দ্বারাও পরিচালিত হয়েছেন। আবার সমকালীন মার্কিন কাব্যান্দোলনের ফসল বিটনিক ও কনফেশনাল কবিদের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন। জীবনাচরণে এবং প্রচলিত কাব্যরীতির প্রতি অবজ্ঞা ও অনীহায় তথা জীবনের রুচি নির্মাণে অ্যালেন গিনস্‌বার্গ, অ্যান সেক্সটন ও সিলভিয়া প্লাথ তাঁকে আকৃষ্ট করেছেন। এ কারণে ষাটের দশক তথা শহীদ কাদরীর কবিতার প্রাকরণিক সাফল্যে বৈদগ্ধ্য নাগরিক রুচির স্বাদ পাওয়া যায়, যা শিল্পকে করে তোলে আন্তর্জাতিক।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদঃ শব্দ ও ভাষা

কবি মাত্রই সংবেদনশীল, তাঁর অন্তর্লোক ও বহির্লোক কাব্যজ চেতনায় ভাস্বর। বাংলা কবিতার আধুনিকতম কবি শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ আর শহীদ কাদরী। শহীদ কাদরী আধুনিকতায় অনন্য। আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ সব ধরনের সংস্কার বর্জন। আর এ সংস্কারমুক্ত মনোভাবনার অন্যতম প্রকাশক মাধ্যম হলো ভাষা। যা মানব সভ্যতার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। ভাষা হবার জন্য তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তার অর্থবোধকতা। তাই ভাষা মানব ইন্দ্রিয়ের গভীরতম উপলব্ধিকে ধারণ করে এবং তার ব্যাপ্তিময় স্ফটিক খন্ডকে ছড়িতে দিতে পারে মানবের জীবনপ্রবাহে। এই ভাষাই মানুষের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য উপলব্ধির সংযোগ ঘটায় মানুষে মানুষে। আর মাতৃভাষার মাধ্যমে মানুষ সহজাত প্রবৃত্তির ভেতর থেকে স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে ভাষার পরিস্ফুটণের মাধ্যমে বিকশিত করেন সাহিত্যে। যা ভিন্ন মানুষ, এমনকি ভিন্ন জাতিসমূহের সত্তার মাঝে শাশ্বত আত্মিক মূল্যবোধের সংযোগ ঘটায়। এ প্রসঙ্গে জাত্ত হিঞ্জিয়ান (সোল মাউন্টেন উপন্যাসের জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত চায়নিজ লেখক) বলেছিলেন,

> একজন লেখকের সৃজনশীলতার যথার্থ সূচনা ঘটে তার ভাষার মহৎ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে এবং যেসব মহৎ উচ্চারণ তাঁর ভাষায় এখনো পর্যাপ্তভাবে উচ্চারিত হয়নি। তা অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে। এই যে মানুষের অনুভূতির উৎকর্ষ নন্দনতত্ত্ব। তা মানুষের পরিবর্তনের ইতিহাসকে পেছনে ফেলে স্বমহিমায় দাড়িয়ে থাকবে।
>
> (কালিকলম-ষোড়শ বর্ষ,তৃতীয় সংখ্যা-১৪২৬-১৩৬পৃ)

তাই উন্নত, মেদহীন কবিতা চর্চায় ও প্রকরণ কৌশলে যে অভিনবত্ব কবি দেখিয়েছেন তা নিম্নে আলোচিত হল- শহীদ কাদরী তিরিশের কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতালোক দ্বারা প্রভাবিত। ভাবসম্পদ বিবেচনা ও দৃষ্টিভঙ্গির সামঞ্জস্য থেকে তা সহজেই অনুমানযোগ্য। তিনি কাব্যভাষা নির্মাণে, বাকভঙ্গিমায় ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ নিক্ষেপে, শব্দ ব্যবহারে, ক্রিয়াপদ ব্যবহারে এবং সর্বোপরি নাস্তিকবাদী কাব্যচেতনার উৎসারণে তিনি সুধীন্দ্রঅনুগামী। সুধীন দত্ত যেখানে সংস্কৃতবহুল শব্দাবলী এবং মিথের ব্যাপক ব্যবহার করেছেন, সেখানে শহীদ কাদরী নিছক গ্রামীণ বা চলতি পথের শব্দে ব্যবহার করে কবিতায় এনেছেন নতুন সম্পদ সম্ভার। সেই সাথে মুক্ত করে নিয়েছেন প্রভাবের বন্ধন। সৃষ্টি করেছেন স্বমুদ্রিত ভাষা। প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা, শাহরিক অভিজ্ঞতা, যুদ্ধজাত শব্দ তাঁর কবিতায় অজস্র ধারায় ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্যক্ষ আত্মিক নগরদৃষ্টির শব্দ সৃজনে শহীদের প্রকরণে এসেছে নতুনমাত্রা। নগর প্রেমিক নিবাসী কবির প্রায় যে কোন কবিতা থেকেই তা লভ্য: রেসকোর্স কাঁটাতার, কারফিউ, জিপ, ১৪৪ ধারা, প্যামফ্লেট, পোস্টার, মাইক্রোফোন, রেফ্রিজারেটর, সেলুন, রেস্তোরা, রেকর্ড-প্লেয়ার, ট্যাক্সি, পার্ক, পেভমেন্ট-এইসব নগরোপকরণের শব্দ ব্যবহার। কবিতার প্রসঙ্গে মালার্মের বক্তব্য-

কবিতা হচ্ছে শব্দের খেলা, আসলে তা কিন্তু নয়, শেষ পর্যন্ত এই মালার্মের কবিতাই শব্দের প্রলাপে পরিণত হয়েছে। একজন কবির যদি জীবন সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস থেকে থাকে তবে তা তার কবিতায় উঠে আসবে – এটাই তো স্বাভাবিক। যারা দর্শনে বিশ্বাস করে, তাদের লেখায় সেই দর্শনের কথা তো থাকবেই। কবিতা শুধু শব্দ আর ভাষার খেলা নয়। আমি বক্তব্য বিবর্জিত কবিতায় বিশ্বাস করি না।

(শহীদ কাদরীর সাথে কথাবার্তা–মুহিত হাসান সম্পাদিত -১২৭ পৃ:)

শহীদ কাদরীর কবিতার ভাষা ও শব্দ নির্মাণ স্বতন্ত্র ও নিরীক্ষাপ্রবণ। নাগরিক জীবনবোধ ও জীবন-যাপনের সম্পর্কসূত্রে যেসব শব্দাবলি অনিবার্যভাবে বারংবার শহীদ কাদরীর কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে, তার মধ্যে গাড়ি, টেলিফোন, রেস্তোরাঁ, ট্রাউজার, পাৎলুন, মখমল, এভেন্যু ফ্ল্যাট, রাস্তা, ফুটপাত, বেলুন, উদ্বাস্তু, উন্মুল, কফি, টাইপ, রাইটা, সিনেমা, মাইক্রোফোন, পোস্টার, করিডোর, টেলিগ্রাফের তার, শহর ছেড়া, বেঁধা, রক্ত, ছুড়ে মারা ইত্যাদি রয়েছে। যে কারণে শহীদ কাদরীর কাব্যভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য নাগরিক জীবনের প্রাত্যহিক ব্যবহার্য শব্দেরই শিল্পীত প্রকাশ। দৃষ্টান্তস্বরূপ–

ক. ভেসে যায় ঘুগুরের মতো বেজে সিগারেট-টিন/ভাঙা কাঁচ,সন্ধ্যার পত্রিকা আর রঙিন বেলুন
মসৃণ সিল্কের স্কার্ফ,ছেড়া তার,খাম,নীল চিঠি/লন্ড্রির হলুদ বিল,প্রেসক্রিপসন,শাদা বাক্সে ওষুধের
সৌখিন শার্টের ছিন্ন বোতাম ইত্যাদি সভ্যতার/ভবিতব্যহীন নানাস্মৃতি আর রঙবেরঙের দিনগুলি/
(১/১ বৃষ্টি বৃষ্টি,পৃ:১৩)

খ. মনে হয় যেন বার্মা টিকের নিপুণ পালিশ,/সেগুন কাঠের ওয়ডরোব
গিলে খাবে বুঝি পৃথিবীর সব (১/৭-প্রেমিকের গান,২১পৃ:)

দেশজ শব্দ প্রয়োগের সমীক্ষা আছে– 'শেষ বংশধর', 'চন্দ্রাহত সাঙাৎ' ও 'ধেই ধেই ধেই করতে করতে যাব' কবিতায়। এ কবিতায় এমন খোলামেলা ব্যঙ্গ ও কথাবুলি জায়গা নিয়েছে যে কাদরীর সুধীন্দ্রিয় অনুশাসনকে চ্যাঙদোলা করে ছুড়ে মেরেছে। কাদরীর ব্যক্তিগত জীবনাচারের সবকিছু এ কবিতায় ফুটে উঠেছে। হাসি-মস্করা, ইৎরামি-ফাজলামি করার ঢঙে কবি নির্মাণ করেছেন তাঁর কাব্যভাষা। তিনি এই কবিতার শিল্পাঙ্গনে সাক্ষাৎ ইৎরামি, কলকে, আ-তু, আইলো-না, অখন আমাগো, বরাৎ,আন্ধা, বান্ধাজ্যান্ত, ধীমান, বেবাক ইত্যাদি শব্দ এনে সৃষ্টি করেছেন সেই আকাঙ্ক্ষার বীজ। যা তিরিশ ও তিরিশোত্তর কবিদের চর্চাধীন ছিল। এ কবিতায় ব্যঙ্গ শাণিত রূপ পেয়েছে দেশজ ও চলতি কথার ব্যবহার । বরমাল্যে, বিলকুল বেয়াকুফ যুবা পুটলি পেটরাহীন/ন্যাংটা মহারাজ, এমন উচ্চারণ পুরো কবিতায় উপস্থাপিত। তারই অনুরনন কবিতায় প্রকাশিত–

এলাহী এলাহী করে তবে/শীর্ণ পাছা চুলকে চুলকে কেন মিছা চুলবুলি চুটুল চিৎকার
কিসের আহ্লাদ তবে নাগরেরা/চুলের বাদাম-গুড়া ঠান্ডা রাতে চাষাড়ে হাওয়ায়
আপাদমস্তক মুড়ে শার্ট পাৎলুনে, অশ্লীল শব্দের /ধ্যানে/

কোন্ জ্ঞান ধরা দেবে আমাদের গুনাহগার অন্ধকার যৈবনে/
কোন আলো এই এক বাঁজা ধুম্‌সি ভাতার–ছাড়া/ মাতারির মুখর চুম্বনে।
(শ.ক, ১/৩৯-ধেই ধেই ধেই করতে করতে যাব, ৬১ পৃ:)

শহীদ কাদরীর *'উত্তরাধিকার'* ছাড়াও *'তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা'* এবং *'কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই'* কাব্যগ্রন্থেও লোকজ শব্দ, আঞ্চলিক, দৈনন্দিন ভাষা, ঐতিহ্যসূত্রে গাঁথা ধর্মীয় অনুস্মৃতিমূলক, ব্যঙ্গ রসাত্মক শব্দ নিপুণ শিল্পীর হাতে ব্যবহার করেছেন। তাঁর এই প্রকরণ কৌশলের নৈপুণ্য বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে উন্মোচন করেছে নতুন দ্যুতির ফলক । সেইসাথে সমৃদ্ধতর করেছেন কবিতা নির্মাণ কলার চাতুর্য ভঙ্গিমা। শহীদ কাদরীর বহুমাত্রিক অনুষঙ্গের জীবনপ্রদ শব্দ ব্যবহার তাঁর কাব্যভাষাকে করেছে সুষমামন্ডিত ও স্বাতন্ত্র্য। দেশভাগ, গণঅভ্যুত্থান, গণযুদ্ধ ও শোষণ-ত্রাসের নির্মমতায় রক্তের ভেতর সাঁকো-বেধে পার হয় বিধ্বস্ত গোলন্দাজরা। যখন চারিদিকে বিস্ফোরণ করছে টেবিল , এমনকি গর্জে উঠেছে টাইপ রাইটার, ঠিক তখন বিধ্বস্ত নীলিমার সময়ে শহীদ কাদরীকে নিয়ে অনেক কথা বলা যায়। শহীদ কাদরী কবিতায় কুহক ছড়িয়ে শব্দের ভেতর অন্য এক শব্দার্থে বিপরীত উচ্চারণ করেন যার উচ্চারিতরূপ –'আমরাই আত্মার মতো প্রাঙ্গনে তরুন কুকুর।' শহীদ কাদরীর কবিতার' পাবে না, পাবে না 'এই সহজ- সরল- নিরাভরণ পংক্তির আভায় মানুষের অন্তহীন মহাযাত্রার কথা প্রকাশিত। গোধূলিতে, প্রপঞ্চের জ্যামিতিতে এই একই সুরধ্বনি পাবে না, পাবে না। আশ্চর্যের ব্যাপার তাঁর কবিতার ভেতরে মানবাত্মার শুশ্রূষাও এই -'পাবে না'। এমনকি প্রিয়তমাকে চুম্বনের মুহূর্তেও যেন চুম্বিত চিবুকের বিপরীতে এই কথা লেখা হয়ে যায়- 'পাবে না'।

যুদ্ধ এবং ভায়োলেন্সের বাকপ্রতিমা নির্মাণে তিনি পঞ্চাশ এবং পঞ্চাশোত্তর ইংরেজি কবিদের দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। যুদ্ধ পরবর্তী ইঙ্গ মার্কিন কবিগণ তাদের ভাষায় তুলে আনেন আক্রমনাত্মক উপমা ও শ্লেষ। শহীদ কাদরী যুদ্ধাভিজ্ঞতার সাথে যুক্ত করেছেন ইঙ্গ মার্কিন কবিদের কবিতার দৃপ্ত আক্রমণাত্মক ভঙ্গি। যে কারণে তাঁর কবিতায় যুদ্ধ শব্দ– গ্রেনেড, মাইন, কাঁটাতার , বন্দীশিবির, ট্যাংক, মেশিনগান প্রভৃতি উঠে এসেছে। সহিংস প্রকাশক শব্দ ও ভাষা তার 'স্ফিৎসোফ্লেনিয়া' কবিতায় দেখা যায়। আড্রিয়ান হেনরির প্রকরণগত কৌশলের চমৎকার বৈশিষ্ট্য হল -পুনরুক্তির ব্যবহার। বাচনিক প্রাবল্য এবং শ্রোতার উপর বিশেষ ধরনের অভিঘাত সৃষ্টির জন্য পুনরুক্তির কৌশল মৌখিক সাহিত্যে প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। যা শহীদ কাদরীর কবিতা 'রাষ্ট্র মানেই লেফ্‌ট্ রাইট লেফ্‌ট্ ' এবং 'তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমার' কবিতার ভঙ্গি ও আবহে লক্ষ্য করা যায়। সেইসাথে কিছু শব্দ শহীদ কাদরীর প্রিয়। যেমন- সোনালি, উজ্জল, প্রোজ্জ্বল, রাঙা, অলীক, অলৌকিক ইত্যাদি। অনেক সময় অযথা শব্দ ব্যবহারও করেছেন তিনি। উদাহরণস্বরূপ- সোনালি, অলৌকিক ইত্যাদি। তাঁর পরবর্তীদের মধ্যেও এই শব্দগুলোর স্বেচ্ছাকৃত ও ভুল ব্যবহার পরস্পর আবহ নষ্ট করে। যা হোক, আরও অনেক কিছুর সঙ্গে অকপট

রচনাশৈলী শহীদ কাদরীর একটি বৈশিষ্ট্য। যা অনেকটা চারণ কবির চলনে দুঃসাহসিক উচ্চারণে তিনি প্রকাশ করেন –

ভয় নেই/আমি এমন ব্যবস্থা করবো যাতে সেনাবাহিনী
গোলাপের গুচ্ছ কাঁধে নিয়ে /মার্চপাস্ট করে চলে যাবে
এবং স্যালুট করবে /কেবল তোমাকেই প্রিয়তম।
(শ.ক,২/৩১-তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা-১১১পৃ;)

কিংবা

রাষ্ট্রপ্রধান কি মেনে নেবেন আমার প্রস্তাবগুলো
জেনারেলদের হুকুম দেবেন রবীন্দ্রচর্চার? মন্ত্রীদের...
প্রতিটি পুলিশের জন্যে আয়োনেস্কোর নাটক/ অবশ্য পাঠ্য হবে,
সেনাবাহিনীর জন্যে শিল্পকলার দীর্ঘ ইতিহাস;
রাষ্ট্রপ্রধান কি মেনে নেবেন আমার প্রস্তাবগুলো /মেনে নেবেন?
(শ.ক, ২/১৮- রাষ্ট্রপ্রধান কি মেনে নেবেন,-৯০ পৃ:)

ভাষার আত্মপ্রসাদী গাথুনীতে কবি সামরিক উত্থান নয়, শিল্প ও গরিমার মধ্যেই মুক্তির আচ্ছ্বাস খুঁজেছেন। কবি যুদ্ধের প্রতি ঘৃণা ও প্রেমেই তাঁর নিখাদ আশ্রয় খুঁজে পেয়েছেন। শহীদ কাদরী কাব্য প্রকরণে নৈর্ব্যক্তিক ঢঙে নাগরিক শব্দের ও বাক্-বিন্যাসের দ্যোতনায় সংহত আবেগ প্রকাশ করেন। সেই সাথে ইংরেজি বাক-বিন্যাস, বোদলেয়ারিয় ক্লেদাক্ত জীবন ও ক্ষতার্ত অবক্ষয়ের অনুষঙ্গবাহী শব্দচিত্র এবং প্রতীক শব্দের প্রয়োগ বহুলতায় হয়ে উঠেন স্বতন্ত্র নগরসাধক। মানুষে মানুষে আস্থা ও আশ্বাসের সম্পর্ক কবিরা কামনা করেন। যে কারণে শহীদ কাদরী 'সঙ্গতি' কবিতায় বিসঙ্গতিকে ধরতে চেষ্টা করেছেন। মানুষের সচেতন বোধ -বুদ্ধি- বিবেক, তাঁর মনুষ্যত্ব যা কিছু চায়, তার সবটাই হচ্ছে ইতিবাচক। জটিল নাগরিক জীবনের প্রকাশক বলেই শহীদ কাদরীর বাক্যসমূহ জটিলতাশ্রয়ী, গ্রন্থিল ঘূর্ণাবর্ত ক্রমাগত তৈরী করে চলে। শব্দের ব্যবহারে তাঁর অরক্ষণশীল মনোভাব স্নায়ু উত্তেজনা তৈরি করে।

ভাষা ব্যবহারে জীবন উদ্দীপকে বিশ্বাসী সৃষ্টিশীল লেখকের কাজ হলো–সময়ের স্পন্দনকে ধরে রাখা। আর তার অন্যতম প্রকাশক মাধ্যম হলো ভাষা। ভাষা হচ্ছে প্রবহমান নিয়ত পরিবর্তনশীল একটা ব্যাপার। এলিয়টের তুলনায় শহীদ কাদরীর ভাষা ও শব্দ চয়ন কালিক অর্থে নিকটবর্তী ও ব্যবহারিক অর্থে দৈনন্দিন, যেমন- আঁধার প্রেক্ষাগৃহ, মাতাল প্লাকার্ড, টেলিফোন, পোল, পুরোনো সাইনবোর্ড। শব্দের বিচিত্র ব্যবহারে শহীদ কাদরীর পারদর্শিতা সমসাময়িক অনেক কবিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। যেমন- এক মাত্র ভাব বা কথাকে একটি প্রবহমান

ধারায় প্রলম্বিত করে বাক্য বিন্যাসের বিচিত্র নিরীক্ষায় শহীদ কাদরীর কৃতিত্ব অদ্যবধি দুর্লভ। উদাহরণ হিসেবে নিম্নের কবিতাটি উল্লেখ করা যায়-

বারান্দার ত্রিভুজ কোণে/
খোলা জানালার সারি সারি শিকের ফাঁক থেকে
দেয়ালের ঘুলঘুলির ফোকর দিয়ে /হতাশার একটি রন্ধ্র দিয়ে
সন্তের নিঃসঙ্গতায় দাঁড়িয়ে/নিষ্কাম ভাঁড়ের বিস্ময়ে
মরণের টানেল থেকে/ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায়
দেখি স্নানরত/একটি নারী/নগ্ন।
(শ.ক, ১/১৯-নগ্ন, পৃ: ৩৭)

জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা একটি মাত্র দীর্ঘ বাক্যে বোঝাতে গিয়ে এ কবিতায় কবির বাক্য বিন্যাস হয়েছে এ রকম। এখানে নগ্ননারী দেহ সৌষ্ঠব ও তার অপার সৌন্দর্যকে তুলে ধরতে গিয়ে কবি এই যতিচিহ্নহীন প্রবহমান বাক্যভঙ্গি প্রয়োগ দেখিয়েছেন। ভাস্কর্যসদৃশ প্রতিমা নির্মাণের ছাঁচে শব্দকে ফেলে আবেগ বহমান করে রচিত হয়েছে এ কবিতা। এ রকম শরীর উন্মোচনের মতোই শহীদ কাদরীর শব্দ ও উপমার বিন্যাসও অস্পষ্টতা থেকে ক্রমশ স্পষ্ট হয়েছেন তাঁর অসংখ্য কবিতায়। আব্দুল মান্নান সৈয়দের ভাষায় সুপ্রচুর উপমা - প্রতিমা বিকীর্ণ করে দিয়েছেন তিনি। তার উপমা-প্রতিমা এমনকি সাধারণ উক্তি ও পুনঃপুনঃ ব্যবহারে তাৎপর্যবাহী হয়ে উঠেছে। সবটা মিলিয়ে শহীদ কাদরীর কাব্যঙ্গিকের বিশিষ্টতা নির্ণয় করা সম্ভব তার কাব্যকুশলতার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের ভেতর দিয়ে।

চিত্রকল্পবাদের জনক কবি এজরা পাউন্ডের প্রতি অভিবাদন জানিয়েছেন শহীদ কাদরী। প্রতিসাম্য রচনার পদ্ধতিও তাঁর কাব্যকলায় পাওয়া যায়। সংস্কৃত সংলগ্ন শব্দের পাশে নিছক লোকজ কিংবা চলতি পথের শব্দ ব্যবহার করেছেন কাদরী। কিংবা নিপুণ ব্যবহারে ইংরেজি শব্দ ব্যঞ্জনা তুলেছেন কবিতার ভিতর মহলের। সংস্কৃত ইংরেজি দেশী ও গ্রামজ শব্দ তিনি অক্লেশে ব্যবহার করে কাব্যরীতিতে নতুন দ্যুতি ছড়িয়েছেন। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ-

ক. নিরন্তর গাড়িগুলো পার্ক করা নির্দিষ্ট রাস্তার বাঁকে/সিনেমার কিউ ধরে অনন্তকালে আমি /
আমার ইয়ার্কি আর মস্করা/ইন্দ্রধনু রঙের সরু বেল্ট নিয়ে অফুরন্ত দরাদরি/আমি কিছুই কিনব না।
(শ.ক, ১/৪-আমি কিছুই কিনব না, পৃ: ১৭)

খ. শীতরাতে একটি গরম শাল, নীলরঙা জামা?/
কিছুই ধরে না বুজরুকিভরা হে ইন্দ্রজালিক সান্ত্রের পন্ডিত নগ্নরাত্রে
নেচে নেচে অবশেষে নিবি কি সন্ন্যাস?

(শ.ক,১/২২-বিপরীত বিহার -৪০ পৃঃ)

গ. আমাকেই দেখে তুমি/ ঘোমটা তবু তুলে দিলে বধূ?

তোমার খ্যামটা নাচ /কে দ্যাখেনি?

(শ.ক,১/২৩-নিসর্গের নুন,পৃঃ ৪১)

অথবা,

ঘ. পাখির ছানার মতো দ্রুত সপ্রাণ লাফিয়ে ওঠা/পলায়নপর একটি অপটু/

গোলাপের কম্প্র গ্রীবা ধরে আমিও চিৎকার করে/

বোল্‌লাম: যা দেখছো শুধু ছদ্মবেশ এ আমার/

(শ.ক, প্রাগক্ত)

ঙ. অথচ ও শীতে একা, উদ্ধত আমি আমি শুধু পোহাই না ম্লান রোদ। (শ.ক, ১/৩০-এই শীতে পৃঃ৫১)

তৃতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ অলংকার, চিত্রকল্প, প্রতীক, পুরাণ

সাতচল্লিশোত্তর যেক'জন কবির নাম করা যায় তার মধ্যে শহীদ কাদরী একটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। ত্রিকালদর্শী কবি শহীদ কাদরী দক্ষতার নিপুণ স্বাক্ষর রেখেছেন তার কাব্যশৈলী নির্মাণের ক্ষেত্রে। অলংকার, চিত্রকল্প, প্রতীক, পুরাণ বস্তুবিশ্ব তথা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের রূপ-রস-শব্দ-ঘ্রাণ-স্পর্শ যখন কবিমনের কল্পনামাধুরীতে জারিত হয়ে ছন্দোবদ্ধ ও শিল্পসম্মত অবয়ব লাভ করে তখনই জন্ম হয় কবিতার। কবিতা প্রসঙ্গে শ্রীশচন্দ্রদাস কোলরিজ এর বিখ্যাত সংজ্ঞায় উল্লেখ করেন-

> Best words in the best order; "যাকে বাংলায় এভাবে বলা যায়- "অপরিহার্য শব্দের অবশ্যম্ভাবী বাণীবিন্যাসকে কবিতা বলে। (সাহিত্য তত্ত্বকথা, সম্পাদনা-সম্পাদনা-প্রফেসর আবুল ফজল, পৃ:১৪)

অথবা,ইলিয়টের কথা উদ্ধৃত করে শহীদ কাদরী বলেন,

> কবিতা হবেঃ 'of boredom and glory of life' কবি জীবনকে কেবল তার বহিরঙ্গ থেকে দেখবে না, দেখবে তার অপ্রকাশিত, অন্তরঙ্গ রূপ থেকেও, দেখবে তার নিঃস্বতায় ও পূর্ণতায়। (অভিবাদন শহীদ কাদরী, প্রাগক্ত, পৃ:৫৫)

আর 'কাব্য' সহৃদয় গণের কাছে উপাদেয় হবার জন্য অন্যতম উপাদান হলো অলঙ্কার। সাহিত্যের অলঙ্কার প্রসঙ্গে ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'যে গুণ দ্বারা ভাষার শক্তি বর্ধন ও সৌন্দর্য সম্পাদন হয় তাকেই অলঙ্কার বলে।' শহীদ কাদরীর কবিতায় অলঙ্করনের ক্ষেত্রে উপমা-প্রতীক-পুরাণ ও চিত্রকল্প নাগরিক বৈদগ্ধ্যপূর্ণ জীবন থেকে এসেছে। তাঁর জীবনবোধ প্রকাশক অলঙ্করনে ফারসি প্রতীকবাদী কবি বোদলেয়ার এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উপমা-প্রতীক নির্মাণে শহীদ কাদরী ব্যবহার করেছেন অবক্ষয়িত জীবনচেতনার অনুষঙ্গবাহী প্রতীক উৎস। রুগ্ন গোলাপ, জ্বলজ্বলে জোৎস্না চাঁদ, অনালোকিত, ময়লা, অস্পষ্ট রাত, শব, কবর, মাছ, কুকুর, অশ্ব, অগ্নি, ঝড়, বৃষ্টি, নর্তকী প্রভৃতি শহীদ কাদরীর কবিতার চেতনা, অবক্ষয়িত জীবনের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শনের অনুষঙ্গ হিসেবে তাঁর প্রতীকসমূহ ব্যবহৃত, দৃষ্টান্তস্বরূপ:

১। সৎসঙ্গ লাগেনি ভালো? সজ্জনের কথা?
কৃমিও যায় না যেই দুর্গন্ধের নর্দমায়, পাকে
সেখানে ভাসালি বুক? যেন আমি রখি নি পেতে ফেননিভ দুগ্ধশয্যা
(শ.ক, ১/৬-মৃত্যুর পরে, পৃ:২০)

২। গোপনে লুকিয়ে থাকি যেন তার ঘুমের নিশীথে/ অন্তত নিদেনপক্ষে একলাফে পেরিয়ে দেয়াল
পৌঁছে যেতে পারি যেন আমার কবরে আমি জ্বলন্ত শেয়াল।
(শ.ক, ১/১৪-নিরুদ্দেশ যাত্রা, পৃ:৩০)

৩। কেবলই দেখিয়ে যায়, গহ্বর, কবর আর ম্লান /
পান্ডুর রোগের রাত স্বপ্নহীন শীতার্ত শয্যায়।
(শ.ক, ১/২২-বিপরীত বিহার, পৃ:৪০)

'সেলুনে যাওয়ার আগে' কবিতায় কবি মাথার চুলকে প্রতীকের মাধ্যমে স্বাধীনতা কামী মানুষকে অপ্রতিরোধ্য মনবলের চিত্রকে তুলে এনেছেন–

আমার ক্ষুধার্ত চুলে বাতাসে লাফাচ্ছে অবিরাম /শায়েস্তা হয় না সে সহজে,
.../বর্গীরা আসছে তেড়ে,
ঘুমাও ঘুমাও বাছা, কিছুতেই কিছু হয় না তার.../তবু সে আমার চুল
অন্ধ মূক ও বধির চুল মাস না যেতেই/
আহত অশ্বের মতো আবার লাফিয়ে উঠছে অবিরাম।
(শ.ক, ২/২- সেলুনে যাওয়ার আগে, পৃ:৬৭)

'প্রত্যহের কালো রনাঙ্গনে' শীর্ষক কবিতার গোলাপ শব্দটি কেবল সৌন্দর্যে মূল্যবান না বুঝিয়ে মানবপ্রান্তে প্রতীক ব্যাঞ্জনায় প্রকাশিত-

অনেক দূর থেকে এসেছে এ গোলাপ/আমার করতলে
অনেক রক্ত আগুন পার হয়ে এসেছে এ গোলাপ
আমার বিব্রত করতলে, প্রত্যহের কালো রণাঙ্গনে/
প্রত্যহের কালো রণাঙ্গনে।
(শ.কা, ৩/৮- প্রত্যহের কালো রনাঙ্গনে, পৃ:১২৭)

'আলোকিত গনিকবৃন্দ' কবিতায়ও কবি 'হে রুগ্ন গোলাপ দল' প্রতীকয়নে মুক্তির আকাশ মেলে দিয়েছেন। 'আজ সারাদিন' কবিতার কবি প্রকৃতি ও অন্যান্য উপাদান প্রতীকী ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করেন। এখানে নিসর্গ ও পশুপাখির আবরণের তলে রয়েছে এক বিদগ্ধ জীবন চেতনা। যে জীবন আধুনিক এবং নাগরিক বৃত্তে উদ্বেলিত। যার কবিতার প্রকাশিত রূপ-

আজ সকাল থেকে একজোড়া শালিক/
গোয়েন্দার মতো আমার /পেছনে পেছনে ঘুরছে /
যেন এভিনিউ পার হয়ে নির্জন সড়কে /
পা রাখলেই আমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে ঠিক।
(শ.ক, ৩/১আজ সারাদিন, পৃ:১১৫)

উত্তরাধিকার কাব্যের প্রথম কবিতা 'বৃষ্টি বৃষ্টি' তে তিনি বৃষ্টির প্রতীকে ঔপনিবেশবাদের বিনাশের শক্তিরূপে দেখিয়েছেন। যেখানে প্রবল বর্ষন, যা নূহের প্লাবনের মতোই প্রবল। কবি যেন নূহের প্রতিবিম্ব, একাকী নাবিক কোনো, পাপবিদ্ধ নগরের উদ্ধাস্তু সদস্যদের উদ্ধারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এ প্লাবন গন্তব্যের অনিশ্চয়তা প্রকাশ করলেও পরিবর্তনের সম্ভাব্য সূচক বলে কবি এ প্লাবনকে 'জলের আহ্লাদ' বলেছেন।

আমার নিঃসঙ্গে তথা বিপর্যস্ত রক্তে মাংসে/ নূহের উদ্দাম রাগী গরগরে লাল আত্মা জ্বলে /
কিন্তু সাড়া নেই জনপ্রাণীর অথচ/ জলোচ্ছ্বাসে নিঃশ্বাসের স্বর, বাতাসে চিৎকার/
কোন আগ্রহে সম্পন্ন হয়ে, কোন শহরের দিকে জলের আহ্লাদের আমি এক ভেসে যাবো।
(শ.ক, ১/১-বৃষ্টি বৃষ্টি, পৃ:১৩)

কবি প্রাত্যহিক জটিল জীবনোভিজ্ঞতাকে সঞ্চয় করে সে জারক রসে কাব্য ক্যানভাসে যে কাব্য প্রতীমা নির্মাণ করেন তাই বুদ্ধিপ্রধান কবিতা। আর বুদ্ধিপ্রধান কবিতা প্রকাশের মূল মাধ্যম হলো প্রতীক। নিত্য কাজের মধ্যে মানুষকে আবিষ্কারের জন্য প্রতীক আবশ্যক। আর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় সমৃদ্ধ কবিতা হচ্ছে আধুনিক কবিতার মূল ঐশ্বর্য। এ প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর অর্কেস্ট্রা কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় যা বলেছেন এভাবে-

অভিজ্ঞতাকে যদি আমার যথার্থ প্রকাশ করতে পারি, যদি অভিজ্ঞতা একটা বিশেষ প্রতীকী বিন্যাসের মাধ্যমে সকল জ্ঞানের সম্মুখে উদ্ভাসিত হতে পারে তা হলে তার মধ্যে লোকায়ত এবং লোকোত্তরের সাযুজ্য ঘটবে এবং বহিঃ প্রকৃতি ও অন্তরাত্মার ও একটি আশ্চার্য মিলন ঘটবে। অভিজ্ঞতা যখন প্রতীকীরূপে উদ্ভাসিত হচ্ছে তখন সেই অভিজ্ঞতার মধ্যে আমরা বহিঃপ্রকৃতি এবং অন্তরাত্মার মিলন দেখতে পাবো এবং লোকায়ত ও লোকান্তরের সাজুয্য দেখতে পাবো।
(কালি কলম-পৃ:৪০ সুধীন্দ্রনাথ দত্তেরকাব্যসংগ্রহ,নাভানা,কলকাতা,১৯৬২)

উপরের কথাগুলো প্রেক্ষিতে শহীদ কাদরীর স্মারণীয় হবার পেছনে অন্যতম কারণ তাঁর প্রতীকাশ্রয়ী কাব্য ভাষা।তার দেখবার দৃষ্টি, তাকে রোমন্থন করবার শক্তি এবং কাব্যে প্রয়োগ করবার শৈল্পিক সাহসে কাদরী অনন্য। যার আরও কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ:

১। টুপি থেকে; অগ্রজের তীক্ষ্ম ভর্ৎসনায় বজ্র যেন /জানালায় যমদূতের মতন ত্রাস নেচে নেচে
কেবলই দেখিয়ে যায়, গহ্বর, কবর আর ম্লান/ পাণ্ডুর রোগের রাত স্বপ্নহীন শীতার্ত শয্যায়;
(শ.ক, ১/১৪-নিরুদ্দেশ যাত্রা, পৃ:৩০)

২। পরম পাৎলুন আর চকচকে চালাকির মত সব/ চোখামুখো জুতো,
পরিত্যক্ত একা ট্রেন রৌদ্রঝড়ে, বুড়ো
মুখ পোড়া জানালায়/ প্রাচীন আর্শির মত পারা-ওঠা, সবকিছু আতঙ্ক রটায়।
(শ.ক, ১/২৮-পতন, পৃ:৪৯)

৩। তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা:
ধ্বংসস্তূপের পাশে, ভোরের আলোয় /

একটা বিকলাঙ্গ ভায়োলিনের মতো-দেখলাম তে রাস্তার মোড়ে/

সমস্ত বাংলাদেশ পড়ে আছে ...

(শ.ক, ২/১১-নিষিদ্ধ জার্নাল থেকে, পৃ: ৮২)

৪। ব্ল্যাক আউট অমান্য করে তুমি দিগন্তে জেলে দিলে

বিদ্রোহী পূর্ণিমা...

(শ.ক, ২/১৫-ব্লাক আউট পূর্ণিমা, পৃ:৪৯)

শহীদ কাদরীর কবিতায় প্রতীক ব্যঞ্জনার সাথে সাথে উপমা সৃজনেও রয়েছে মাত্রাগত অনন্যতা।যেমন-উপমা প্রয়োগে চমকপ্রদ ইঙ্গিতময় প্রসঙ্গ 'সঙ্গতি' কবিতায় বর্তমান 'শূণ্য হাঁড়ির গহ্বরে অবিরত তারাপুঞ্জের মতো শাদা ভাত ফুটে ওঠার দৃশ্য' তিনি এঁকেছেন। শূন্য বিশেষণটি এসেছে হাঁড়ির। শহীদ কাদরীর কবিতায় প্রতীকময় উপমা ছাড়াও নানামাত্রিক উপমা প্রয়োগের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।উদাহরণস্বরূপ

- লাল পাগড়ি-পরা পুলিশের মত কৃষ্ণচূড়া হেঁকে বলল: 'তুমি বন্দী'[আজ সারাদিন]
- হে আমার মোরগের চোখের মতন খুব ছেলেবেলা। [যাই যাই]
- আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও:
- দু টুকরো রুটি কিংবা লাল শানকি ভরা/এবং নক্ষত্রকুচির মতন কিছু লবনের কণা
  দিগন্তের শান্ত দাওয়ায় আমাকে চাও নি তুমি দিতে /তাই এ দীর্ঘ পরবাস।[তাই এ দীর্ঘ পরবাস]
- কিন্তু বৈশাখের খররৌদ্র সোনালী খড়বাহী /গরুর গাড়ীর মতো /
  মন্থরভাবে এগিয়ে চলেছে এই কবিতা। [একে বলতে পারো একুশের কবিতা]
- অমাবস্যায় গোলাপঝাড়ের মত পুঞ্জপুঞ্জ জোনাকি /ভরে রয় রাত্রির ময়দানগুলো জুড়ে
  এবং যুগল পিদিমের মত যার চোখের আশ্বাসের আলোয়/
- তরুণ ঘোড়ের পিঠে দ্রুত পেরিয়েছি শৈশব, কৈশোর। [১/১১-জানালা থেকে,পৃ:২৬]
  গোয়েন্দার মত একজোড়া শালিক।
- বুনো একরোখা মোষের মতো বাতাস।
- লাল গোলাপের মত মোরগ।
- সূর্যাস্তের মতো লাল রক্ত।
- চায়ের ধূসর কাপের মতো রেস্তোরাঁয়।
- শাদা কুয়াশায় মোড়া নার্সের মতো গাছ।
- ওষুধের ফোঁটার মত বিন্দু বিন্দু শিশির।
- মোরগের চোখের মতো খুব ছেলেবেলা।
- সুগোল তিমির মতো আকাশের পেটে বিদ্ধ হলো বিদ্যুতের উড়ন্ত বল্লম।
- ভেসে যায় ঘুঙুরের মতো বেজে সিগারেট টিন ভাঙা কাচ, সন্ধ্যার পত্রিকা আর রঙিন বেলুন।

- হাওয়ায় পালের মতো শার্টের ভেতর ঝকঝকে সদ্য নতুন নৌকার মতো একমাত্র আমি।
- অনুর্বর মহিলার উদরের মত আর্ত উৎকণ্ঠিত নপুংসক সন্তের উক্তি।
- সোনালি পয়সার মত দুই পকেট ভর্তি স্বপ্নের ঝনৎকার।
- আমি ঠিক জানি চড়ুইপাখির মতো ঠোঁটজোড়া কাঁপছে। [টেলিফোন আরক্ত প্রস্তাব।]
- সোনালি জরির মতো জোনাকিরা নক্সা জ্বেলে দেবে। [নশ্বর জ্যোৎস্নায়]
- ধনুকের মত টংকার দিল টাকা
- বাউলের একতারার মতো বেজে ওঠে চাঁদ।
- বাখানে ঝুলন্ত চাঁদ জবার মত লাল।
- রাশি রাশি সোনার মোহর ভর্তি রূপালি এক ঘড়া।
- টলটলে দ্রাক্ষার মতহ ঠোঁট ফাটে।
- আর তার মার্বেলের মত ঠান্ডা নিরেট চোখে ঔৎসুক্য একজোড়া রাঙা মাছের মত হঠাৎ নড়ে উঠলো।
- ট্রাফিক সিগন্যালের মত নরসুন্দর ।
- কার্বাইনের নলের মতো হলুদ গন্ধক-ঠাসা শিরা-

শর্করার মতো রাশি রাশি নক্ষত্রবিন্দুর স্বাদে রুচি নাই।শর্করার মতো রাশি রাশি নক্ষত্র বিন্দুর স্বাদে রুচি নেই, এর স্থলে নক্ষত্রের মতো রাশি রাশি শর্করার স্বাদে রুচি নেই। কাদরী নক্ষত্রের উপমা ভেঙে দিয়ে প্রতীপ অলংকার সৃষ্টি করেছেন। প্রতীপ, প্রতিরূপক, অতিযুক্তি অত্যযুক্ত অলংকার ব্যবহার করে প্রচলিত মোটিফ গুলির নতুন দৃষ্টিকোণ তৈরী করেছেন। যা বেশ ইঙ্গিতময়। এ কবিতায় কবি বিসঙ্গতির সঙ্গতিকে ধরার চেষ্টা করেছেন।
(শ.ক, শহীদ কাদরী স্মারক, পৃ:১৩)

উপরে বিবৃত উদ্ধৃতিগুলো খরদীপ্র প্রতীকাশ্রিত উপমা, যা বাংলা সাহিত্যে বিরল। তাঁর দৃষ্টির ভাষাই হলো কাব্যভাষা। যে কবিদৃষ্টি বিপরীতের মধ্যে বিনিময়ের একটা সেতু তৈরী করে দেয়। এ প্রসঙ্গে আমরা আবদুল মান্নান সৈয়দের কথার কথা মিলাতে পারি। 'কাদরীর আত্মদৃষ্টি প্রসাদী কাব্য ভাষার বিশিষ্ট সন্ধান করা যেতে পারে তাঁর বিশিষ্ট কাব্যকুশলতার ভিতরে। এই কুশলতা ভর রেখে আছে তাঁর মুদ্রাঙ্কিত উপমা, প্রতিমা ও প্রতিতুলনার ওপর। কাদরীর আত্মভাষা বিশেষভাবে জাগ্রত হয়েছে তাঁর প্রতিতুলনা [তুলনামূলক বৈষম্য ও বৈসাদৃশ্য প্রদর্শনের জন্য কোন চিত্রকল্প], প্রতিষঙ্গ ও প্রতিসাম্যের উপর; তাঁর উপমা ও প্রতিমা দুইই দাঁড়িয়ে আাছে প্রতিতুলনা দক্ষতায়।শহীদ কাদরী উপমা ও প্রতীক ব্যবহার ছাড়াও তাঁর কাব্য কুশলীতে সমাসোক্তি অলংকারের সংযুক্তি ঘটিয়ে মাত্রাগত সংযোজন ঘটিয়েছেন। বস্তুতে প্রাণারোপ করে প্রকৃতির সঙ্গে মানবিক ভাবনার অনুষঙ্গ এখানে প্রকাশিত -

বাতাস আমাকে লম্বা হাত বাড়িয়ে/

চুলের ঝুঁটি ধরে ঘুরে বেড়িয়েছে আজ সারাদিন/
কিংবা লাল পাগড়ি পড়া পুলিশের মতো কৃষ্ণচূড়া/
হেঁকে বলল/তুমি বন্দী।
(শ.ক, ৩/১-আজ সারাদিন, পৃ: ১১৫)

তখন প্রকৃতির উপাদানগুলো শুধু যে চমৎকার সমাসোক্তি অলংকার হয়েছে বলেই কবিতায় মূল্যবান হয়ে উঠেছে তা নয়। প্রকৃতির উপাদানগুলো 'কবি' নামক মানুষের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বলেই সমাসোক্তি অলংকারগুলোও চমৎকারিত্ব অর্জন করেছে।

একই সাথে শহীদ কাদরী প্রচলিত প্রয়োগকে ভেঙে দিয়ে প্রতীপ অলংকার সৃষ্টি করেছেন অনেক কবিতায় প্রতীপ প্রতিরূপকে, অতিযুক্তি, অত্যযুক্ত অলংকার ব্যবহার করে প্রচলিত মোটিফগুলির নতুন দৃষ্টিকোণ তৈরি করেছেন। উদাহরণস্বরূপ–

দো-নলা বন্দুকটার কথা বলা হলো না /
অথচ ওটাই আসল। শিকার করেছিলাম
ঝাঁকে ঝাঁকে বালিহাঁস। দেখলাম গ্রামবাংলার
শাদা-মাঠ সরল লোকগুলো ঐ পাখিদের মাংস
খুব পছন্দ করে চেটেপুটে খেলো।
(শ.ক, ৩/২৬-খুব সাধ করে গিয়েছিলাম, পৃ: ১৬৪)

'কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই 'কাব্যগ্রন্থের 'খুব সাধ করে গিয়েছিলাম' কবিতায় কবি গ্রামে গিয়ে দেখেন গ্রামের মানুষ শিকার-করা বালিহাঁসের মাংস খাচ্ছে। এই ব্যাপারটি তাঁকে বিস্মিত ও বিপন্ন করেছে। তাই গ্রামের প্রতি টান থাকলেও কবি গ্রাম থেকে প্রত্যাবর্তন করতে চান। অন্যদিকে নগরের মানুষের আত্মকেন্দ্রিকতায়ও কবি ব্যথিত হন। 'বৃষ্টি বৃষ্টি' কবিতায় নূহের মিথ ব্যবহারের মাধ্যমে শহীদ কাদরী বিগত সময়ের আরেক প্লাবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, যে প্লাবনেরও আবির্ভাব ঘটেছিল মানুষের পাপের ভারে। কবি ত্রাতা , তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি; একমাত্র তিনিই পারেন ধ্বংসোন্মুখ নগর থেকে তাঁর নাগরিককে বাঁচাতে। যে কারণে পুরাণের মিথ এখানে বর্তমান। প্রতিসাম্য ও প্রতিতুলনা রচনার পদ্ধতিও শহীদ কাদরীর কাব্যকলায় পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ–

- পৈতৃক সম্পত্তিরূপে পাওয়া বাল্যকালেপ্রোজ্জ্বল বন্দুক/
  যার নল দুটো তোমার চোখের চেয়ে কালো/এবং গভীর তো বটেই।
- আজকে তাই তোমার দেয়া কোমল লাল গোলাপ/তীক্ষ্ণ হিম ছুরির মতো বিঁধল যেন বুকে। [গোলাপের অনুসঙ্গ]
- একবার শানানো ছুরির মতো তোমাকে/হিরন্ময় রৌদ্রে জ্বলজ্বলে। [একবার শানানো ছুরির মতো]

শহীদ কাদরী প্রচুর পরিমানে উপমা-প্রতিমা বিকীর্ণ করে দিয়েছেন তাঁর কবিতায়। শহীদ কাদরী সবসময় 'বৃষ্টি বৃষ্টি' কবিতাকে তাঁর 'ওয়েস্ট ল্যান্ড' বলেছেন। কবিতা যেদিন লেখেন সে দিনও বৃষ্টির দিন ছিল। তবে এলিনিয়েশন বিন্যাস দেখা যায়। যারা অত্যাচারী তারা সবসময় ভীত, আর বৃষ্টির জল ধুয়ে মুছে দিচ্ছে আমাদের সমস্ত পাপচিহ্ন। সে কারণেই তিনি নূহের সেই প্লাবনকে কবিতায় এলিনিয়েশন হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এলিয়ট যে অর্থে মরুভূমিকে তাঁর ওয়েস্ট ল্যান্ড নিয়ে এসেছেন। কাদরী অনেক কবিতার oxymonon বা প্রতীপাভাস সৃষ্টি করেই তাঁর বাণী-জগৎ নির্মান করেছেন। রাত্রির উঠোনে মরা মাছের আঁশের জ্যোৎস্না প্রতিম উজ্জ্বলতা, কবরের ফাটলে ফাটলে প্রবেশকারী বাসন্তী হাওয়া, লাশের চক্ষু কোটরে টিয়ে পাখির লাল-সবুজ আক্রমন, নগ্ন ভিখিরির নাভিমূলে শিশিরের হীরক কাসফেট এইসব বিরোভাস সৃষ্টি করেই কাদরী দেখিয়ে দেন মৃত্যুর উর্ধ্বে উড়ছে জীবনের জয়-নিশান।

অলংকার -প্রতীক -পুরাণ ব্যবহারের সাথে সাথে প্রাত্যহিকতার চিত্রকল্প, সময়ের অবিকল প্রক্ষেপণ, পরিচিত মানবীয়- আবেগের আশ্রয়ে চিত্রিত শব্দবন্ধে শহীদের কবিতা অর্জন করেছে স্বতন্ত্র প্রাণশক্তি। নাগরিক অবক্ষয়, ক্লীবত্ব প্রাপ্ত পঙ্গু জীবনের অপচয়িত যৌবন, নষ্ট নপুংসক, কামপ্রতপ্ত, ময়লা সৌন্দর্যকে প্রত্যক্ষ করে কবি দুঃসহ নাগরিক জীবনের যন্ত্রণা ও অনিবার্য পঙ্কিল নিয়তিকে চিত্রকল্পের আভরণে প্রকাশ করেন। যদিত্ত সাদৃশ্যমূলক অলংকারের মধ্য দিয়েই কবি চিত্রকল্প রচনা করেন।সেইসাথে চিত্রকল্পে থাকে আবেগ ও কল্পনার গভীর সংযোগ। অর্থাৎ চিত্রকল্প হলো ভাবনার সংহত ভাষারূপ। এ প্রসঙ্গে সিসিল ডে লুইস চিত্রকল্পকে কবিতার জাদু দর্পন বলে অভিহিত করেন। চিত্রকল্প প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের মর্মকথা হলো- চোখের ছবিতে মন নিজের ছবি জুড়ে দেয়, আর তাই সে ছবি মানুষের কাছে সম্পূর্ণ হয়ে ত্তঠে। বহিবিশ্বের এই ছবির সঙ্গে যখন কবির নিজেরকল্পনা ও ভাবনার মিথষ্ক্রিয়া ঘটে তখনই চিত্রকল্প বাঙ্ময় হয়ে ত্তঠে। আর চিত্রকল্পের চমৎকারিত্ব করাই কবির কবিত্ব । যুদ্ধ বিধ্বস্ত বস্তুবিশ্বে ব্যক্তির হতাশা, নেতিবাচক দ্বন্দ্ব, আকাঙ্ক্ষা প্রেমের মত বিমূর্ত চেতনা ঘনীভূত হয়ে শহীদ কাদরীর কবিতায় চিত্রকল্প উঠে এসেছে। তারই কাব্যিক প্রকাশ–

> আর ঐ ডাক সাইটে লাল ঘোড়া /যদি ধরে ফেলে এই কামরার গোধূলিকে ছত্রখান করে
> না-না-না /আমি জানি চড়ুই পাখির মতো ঠোঁটজোড়া কাঁপছে। (শ.ক,১/৩- টেলিফোনে আরক্ত প্রস্তাব,পৃ:১৬)

ভাববাদী ও অতি-তরল রোমান্টিক কাব্যাদর্শের প্রতি বিরোধিতা থেকেই চিত্রকল্পবাদী কাব্যান্দোলনের জন্ম হয়েছিল। শহীদ কাদরীর যে সকল কবিতায় চিত্রকল্পের অনন্য দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায় , যা নিম্নে উল্লেখ করা হল

- নামলো সন্ধ্যার সঙ্গে অপ্রাসন্ন বিদ্যুৎ/ মেঘ জল হাওয়া -
  হাওয়া ময়ূরের মতো তার বর্ণালী চিৎকার/কী বিপদগ্রস্ত ঘর দোর,/
  ডানা মেলে দিতে চায় জানালা -কপাট /

নড়ে ওঠে টিরোনসিরিসের মতন যেন প্রাচীন ত্র বাড়ি। (শ.ক, ১/১-বৃষ্টি বৃষ্টি, পৃ: ১১)

এখানে কবি সন্ধ্যার আবহে বিদ্যুতের অপ্রসন্ন চিত্র অনুসন্ধানে বিপদগ্রস্ত জনতার অসহায়তার তীব্ররূপ বোঝতে প্রকৃতিকে তান্ডবপূর্ণ ছবিতে তুলে এনে চমৎকার চিত্রকল্প যোজনা করেছেন। তিনি জীবন সত্যের উপলব্ধিতে কল্পনা ও ভাবের সংযোগে গভীরতর চিত্র ভাষা প্রদান করেছেন। চিত্রকল্পবাদের জনক কবি এজরা পাউন্ডের প্রতি অভিবাদন জানিয়েছেন শহীদ কাদরী।

সেইসাথে চিত্রকল্প-প্রতীক পুরাণ বিনির্মাণেও রেখেছেন অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর। যা কালের প্রবাহে অনন্যতার প্রতিমূর্তি হয়ে প্রতিভাত হবে। চিত্রকল্প হলো দৃশ্যব্যঞ্জনার মূর্ত রূপ তথা মনন ও বুদ্ধির সমন্বিত ইন্দ্রিয়াতীত বিমূর্ত রূপায়ণ। কাদরী রচিত চিত্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে 'বস্তুচিত্র, শব্দচিত্র, গন্ধচিত্র,দৃশ্যচিত্র, স্পর্শচিত্র এবং সেইসঙ্গে ভাব,ভাবানুষঙ্গ ও মননের মিশ্রণ' [বিপ্রদাশ বড়ুয়া ১৯৭৬:১০৫] । দৃশ্য-শ্রুতি-স্পর্শ-স্বাদ যে কোন কবির চিত্রকল্প নির্মাণে জন্ম দেয় বহুমাত্রিকতার। আর তারই নির্মেদ প্রকাশ নিম্নরূপ–

১। নাসারন্ধ্র অশ্বের মতন ফোঁপায়, মুখ থেকে /নামে কষ জীবনের সমান সতৃষ্ণ, শান্তিহীন সহিষ্ণুতায়/রগ টেনেটেনে কেউ শক্ত হাতে বুঝিবা বাজাবে,/ ঝিম ধরে মাথার ভেতর; ভালোবাসার আরও মাকড় /জাল রাখে, খুব আস্তে এই সর্বেসর্বা মাংসে, রক্তোচ্ছ্বাসে (শ.ক, ১/২১ মোহন ক্ষুধা, পৃ:৩৯)

২। কোন সংগোপন উৎস থেকে বেরিয়ে আসছে /অনর্গল ছেঁড়া-খোঁড়া দৃশ্যগুলো;/
একই মদির অশ্ব বারবার লাফিয়ে উঠছে /বাতাসে শূন্যতায়- বাগানে ঝুলন্ত চাঁদ
জবার মত লাল।
(শ.ক, ১/১৭-পরস্পরের দিকে, পৃ: ৩৪)

৩। তবে কি দশ লক্ষ কৃমি তুমি? ধূর্ত কোন শেয়াল?/
যখন থাকে না গাঁ এর লোক, ঝোপের আড়ালে তুমি,/
তুমি-ই ভবিষ্যৎ আমার দুটো, লাল চোখ মেলে ওঁৎ পেতে থাকো/
হারে বিধি! যেমন কর্ম তার তেমনি নষ্ট ফল।
(শ.ক, ১/১৮-সমকালীন জীবন দেবতার প্রতি, পৃ: ৩৫)

৪। তীক্ষ্ণধার জনতা এবং তার একচক্ষু আশার চিৎকার
পূর্ণিমা-প্রেতার্ত তারা নির্বীজ চাঁদের নীচে, গোলাপ বাগানে
ফাল্গুনের বালখিল্য চপল আঙ্গুলে, রুগ্নউরু প্রেমিকার/
নিঃস্বপ্ন চোখে 'পরে নিজের ধোঁয়াটে চোখ রাখে না ভুলেও,
(শ.ক, ১/২-নপুংসক সন্তের উক্তি, পৃ: ১৪)

এখানে উল্লেখ্য যে, বোদলেয়ারের নগরচিত্র ও এরকমই নষ্ট, রুগ্ন, প্রেতময়, স্বাস্থ্যহীন বীর্যের আড়ম্বরে নির্মিত। শহীদ কাদরী ঘোড়া ব্যাঞ্জনায় নৈরাশ্যচিত্রে বাস্তবতার অনুপুঙ্খ রূপ তুলে এনেছেন। সেইসাথে কবি পূর্ণিমা,গোলাপ শব্দ ব্যবহারে আশাহত জীবনে আশাপূর্ণ মুক্ত জীবনের আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন মননশীল চিত্রকল্প বিনির্মাণে মাধ্যমে। 'বৃষ্টি বৃষ্টি' কবিতায় কবি নগরবাস্তবতার ভিন্নরূপকে প্রত্যক্ষ করার ক্ষেত্রে আকস্মিক বজ্রপাতকে, তুমুল বৃষ্টিপাতকে সন্ত্রাসের সাথে তুলনা করেছেন, সেইসাথে তৈরী করেছেন চমৎকার চিত্রকল্প,যেখানে বলা হয়েছে সুগোল তিমির পেটের মতো আকাশ,আর সে আকাশকে বিদ্ধ করছে বিদ্যুতের উড়ন্ত বল্লম।যার কাব্যরূপ–

সহসা সন্ত্রাস ছুঁলো।ঘর-ফেরা রঙিন সন্ধ্যার ভিড়ে/
যারা তন্দ্রালস দিগ্বিদিক ছুটলো,চৌদিকে
ঝাঁকে ঝাঁকে লাল আরশোলার মত যেন বা মড়কে/
শহর উজাড় হবে,বলে গেল কেউ-শহরের
পরিচিত ঘন্টা নেড়ে খুব ঠান্ডা এক ভয়াল গলায়/এবং হঠাৎ
সুগোল তিমির মতো আকাশের পেটে/বিদ্ধ হলো বিদ্যুতের উড়ন্ত বল্লম/
(শ.ক, ১/১- 'বৃষ্টি বৃষ্টি', পৃ: ১১০)

বিরোধাভাসমূলক চিত্রকল্প সৃষ্টিতেও শহীদ কাদরীর রয়েছে অভিনবত্বের স্বাক্ষর। 'ইন্দ্রজাল' কবিতায় কবি টলটলে দাক্ষার(আঙুরের) মতো ঠোঁট ফাটার বিণাশী মুহূর্তের বিপরীতে এক অসাধরণ নৈপুণ্যে স্থাপন করেছেন 'মঞ্জুরিত মাংস' আর 'ইন্দ্রিয়ের সবুজ ঝোপ'। যা যত্নে লালিত স্পর্শগন্ধময় শরীরী স্বপ্নের চিত্রকল্প। দৃষ্টান্তস্বরূপ–

কেউ ঢোকে পার্কে,ঝোপে ঝাড়ে কিংবা/নেমে যায় পিচ্ছিল কৃমির মতো/
স্বপ্নের সুরঙ্গপথে/সহজ,অবাধ,ঠোঁট ফাটে, ঠোঁট ফাটে, ঠোঁট ফাটে
ইচ্ছার মদির চাপে যেন শুঁড়ির রুক্ষ হাতে
টলটলে দ্রাক্ষার মতো/ঠোঁট ফাটে।
তখন মঞ্জরিত মাংসের ঘরে/পাঁচটি প্রদীপ আনে আলোকিত উৎসবের রাত
(ঠোঁট ফাটে, ঠোঁট ফাটে)
তখন ইন্দ্রিয়ের সবুজ ঝোপে/পাচটি ফুল আনে সৌরভের রাত
(ঠোঁট ফাটে, ঠোঁট ফাটে) (শ.ক, ১/২৪-ইন্দ্রজাল, পৃ: ৪৩)

কবি শহীদ স্বদেশ চিন্তার ব্যাপ্তি ছিলো বস্তুজগতের ভেতরে অন্যজগতে। বায়ান্নর পরে রাজনীতির দেয়াল পরিবর্তনে সাথে কবিও তাঁর কাব্যের শব্দকে অস্ত্রের মত শাণিত ও ক্ষিপ্র করে প্রকাশ করেন। স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ তাঁর কবিতাকে করে তোলে প্রতিবাদের হাতিয়ার রূপে। তাই দেশ মাতৃকাকে অভিবাদনের তীব্র আলোকখচিত চিত্ররূপে প্রকাশ ঘটান তার কবিতায়–

হে আমার শব্দমালা,তুমি কি এখনও বৃষ্টিভেজা/বিব্রত কাকের মত

আমার ক্ষমতাহীন ডাইরির পাতার ভেতরে বসে নিঃশব্দে ঝিমুবে/

(শ.ক, ২/১০-কবিতা,অক্ষম অস্ত্র আমার, পৃ:৮০)

সর্বোপরি শহীদ কাদরী তাঁর কবিতায় অলংকার- চিত্রকল্প, প্রতীক- পুরাণ বিনির্মাণে স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রেখেছেন, যা কবিকে দিয়েছে অনন্য উচ্চতা।

তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ছন্দ

ছন্দ অর্থ গতি সৌন্দর্য। যাকে সাহিত্যে বলা হয় ভাষাগত ধ্বনি সৌন্দর্য। অর্থাৎ সৌন্দর্যবোধকে সুনির্দিষ্ট রীতিতে বাক্-বিন্যাসে বা বাণীবিন্যাসে প্রকাশকেই বলা হয় ছন্দ। ছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন–

> কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্য ছন্দ। (সাহিত্য তত্ত্বকথা-প্রফেসর আবুল ফজল, পৃ; ১০০)

অর্থাৎ ভাষার ধ্বনি প্রবাহে গতি-সৌন্দর্য সৃষ্টি করাই ছন্দ, তথা পরিমিত একটি পদবিন্যাসই হল ছন্দ। পঞ্চাশের শেষে পরিণতির ছাপ রেখে কাব্যজগতে প্রবেশ করেন শহীদ কাদরী। তাঁর কবিতা রচনায় ছন্দবিন্যাসে একধরনের বিপন্নতা পরিলক্ষিত হয়। তারপরও তাঁর কিছু কবিতায় স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ– স্বরবৃত্ত (ছুরি, জতুগৃহ, বৈষ্ণব, গোধূলি), মাত্রাবৃত্ত- (‘*উত্তরাধিকার*’ কাব্যগ্রন্থের– প্রিয়তমাসু, শত্রুর সাথে একা, ‘*আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও*’ কাব্যগ্রন্থের ‘পথে হলো দেরি’,‘শূন্যতা’ ও ‘একা’) এছাড়া অক্ষরবৃত্তে-(হে হিরন্ময়, সেলুনে যাবার আগে, শীতের বাতাস) ইত্যাদি। তিনি গদ্য ছন্দে কবিতা লিখতেও পছন্দ করতেন। গদ্যছন্দের উল্লেখযোগ্য কবিতা (শেষ বংশধর,পাখিরা সিগন্যাল দেয়) । শহীদ কাদরীর স্বরবৃত্ত ছন্দে যে সকল কবিতা লক্ষ্যযোগ্য, তার কিছু উদাহরণ ছন্দ বিন্যাসসহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

শাদা রাস্তা/ চলে গেছে/ বুকের মধ্যে [৪+৪+৪]
যে তোমাকে/ ডেকেছিলো /রাধা
আধখানা তার /ভাঙা গলা /আধখানা তার /সাধা

(শ.ক, ২/৭-বৈষ্ণব, পৃ: ৭৬)

অথবা,

সবকিছুই/ বিঁধতে জানে/ছুরির মতো/ [৪+৪+৪]
শাদা মোরগ/চঞ্চুতে তার /বিদ্ধ করে /শস্য কণা/
চামড়া ছিড়ে/সূর্য জ্বলে
ঈগল গুলোর /দারুণ নখে/ ইঁদুর আসে /অনায়াসে
পুকুর জুড়ে/ রুপালি মাছ /লাফিয়ে ওঠে
বড়শী গাঁথা। (শ.ক, ২/২১-ছুরি, পৃ৯৫)

অক্ষরবৃত্তের পাশাপাশি মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বিভিন্ন মাপের ব্যবহার আর স্বরবৃত্তের চটুল দোলা ও চালের প্রয়োগও তাঁর কবিতার লক্ষ্যণীয় বিষয়। ‘সঙ্গতি’ কবিতাটিতে কবি মাত্রাবৃত্তের এক অলস দোলা পুরো কবিতায় উপস্থাপন করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ–

বন্য শুকর/ খুজে পাবে প্রিয়/কাদা [৬+৬+২]
মাছরাঙা পাবে/ অন্বেষণের/ মাছ,
কালো রাতগুলো/ বৃষ্টিতে হবে/ শাদা [৬+৬+২]
ঘন জঙ্গলে/ ময়ূর দেখাবে/ নাচ
প্রেমিক মিলবে /প্রেমিকার সাথে/ ঠিকই
কিন্তু শান্তি /পাবে না,পাবে না,/পাবে না....(শ.ক, ৩/৪-সঙ্গতি, পৃ: ১২০)

কবি এ কবিতায় মাত্রাবৃত্তের মাধ্যমে এক কান্নাময় কারুণ্যকে স্পষ্টতই তুলে ধরেছেন। যেখানে 'বন্য শুকর খুজে পাবে প্রিয় কাদা' শেষ ধুয়ার পর ধীরে ধীরে এক কান্নাময় অভিব্যক্তি লাভ করে, আর তাই চৌদ্দমাত্রার সুবিন্যস্ত বিন্যাস তীব্র আবেগের চাপে কখনও কখনও আঠারো মাত্রায় স্বস্তি খুঁজে ফিরেছে। তাঁর কবিতার আবেগ, প্রজ্ঞা ও ছন্দময়তায় এক সুউচ্চ বৈরী প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। অনিয়মাবদ্ধ মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে কাদরী সম্ভবত সচেতন ভাবেই বর্জন করে চলেন। তার দ্বিতীয় বইয়ের একটি কবিতাও এই ছন্দে নেই। তবে টেলিফোনে আরক্ত প্রস্তাব, প্রেমিকের গান ইত্যাদি কবিতায় মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সংহত আবেগের সংগতিহীন প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

ধনুকের মত/টংকার দিল/টাকা [৬+৬+২]
তোমার উষ্ণ/লাল কিংখাবে/ঢাকা
উজ্জ্বল মুখ/ যেনবা পয়সা/ সোনালি রুপালি/ তামা। (শ.ক, ১/৭-প্রেমিকের গান, প্.২১)

শহীদ কাদরী 'বৃষ্টি বৃষ্টি' কবিতায় নিজস্ব অক্ষরবৃত্ত ছন্দের গতি পরিলক্ষিত হয়- প্রথমে ৮ মাত্রার শো শো* সহসা সন্ত্রাস ছুলো। তারপর যতি নিয়ে ১২ অথবা ২০ মাত্রার দৌড় । এই অপ্রতিরোধ্য চলনে কবিতার শ্রুতিকল্প বক্তব্যটিকে স্বতন্ত্র মাত্রা দিয়েছে। বৃষ্টিতে নাগরিক উপাদান সব ভেসে যাচ্ছে। এ কবিতায় বৃষ্টিকে সরাসরি দেখানোর সাথে বুর্জোয়া সভ্যতাকে এক অবিশ্বাস্য স্বতঃস্ফূর্ত শক্তি এসে ধ্বংস করে দিয়ে যাবে, সে আভাসও বিদ্যমান। এ কবিতাকে কবি তাঁর ওয়েস্ট ল্যান্ড বলেছেন। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বিন্যাসসহ দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ–

সহসা সন্ত্রাস ছুঁলো ।/ঘর-ফেরা রঙিন সন্ধ্যার ভীড়ে [৮+১১/৯/৬]
যারা ছিলো তন্দ্রালস /দিগ্বিদিক ছুটলো, চৌদিকে...
পরিচিত ঘন্টা নেড়ে/ নেড়ে খুব ঠান্ডা এক /ভয়াল গলায় (শ.ক,১/১-বৃষ্টি বৃষ্টি,পৃ:১৩)

কবিতায় একটা সংজ্ঞায় অডেন বলেন

'Poetry is memorable speech' (শহীদ কাদরীর সঙ্গে কথাবার্তা, পৃ:২৪)

তবে টানা গদ্যের কবিতা মেমোরেবল হওয়া প্রায় অসম্ভব। গদ্য কবিতার দৃষ্টান্ত যাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়- র‍্যাঁবোর পুরোটাই টানা গদ্যে, পল ক্লোভেল টানা গদ্যে, এখনকার সময়ের রেনেসাঁ টানা গদ্যেই। বাংলায় অরুণ মিত্রের সব কবিতা টানা গদ্যেই। শহীদ কাদরীরও ছিলেন গদ্যছন্দেও প্রতি অনুরক্ত।

পর্ববিন্যাসের ও যতিস্থাপনের প্রথাগত রীতির উল্লম্ফণধর্মী এবং এ কারণেই তাঁর সিদ্ধান্ত কাদরীর কবিতা অনেক সময় ক্লান্তিকর। কারণ প্রথাগত রীতির বিরামহীন জেরাই। পর্ববিন্যাস ও যতিস্থাপনের বৈচিত্র্য তিরিশের দশকের হতে চলল: অক্ষরবৃত্তের গোনাগুনতি বলয় থেকে মাইকেল অনেক পরে আর একবার মুক্তি দিয়েছিল। তিরিশ ও তিরিশোত্তর কবিদের সমবায়ী প্রযোজনা এরই পক্ষে। 'শীতের বাতাস' কবিতাটি ম্লান ও মন্থর অক্ষরবৃত্তে রচিত। তিনি চেনাজানা মোটিফগুলিকে বিপরীত বিন্দু থেকে তাঁর কবিতায় যুক্ত করেছেন। এই বিপরীত অবস্থানই তাঁর নিজস্বতা, তাঁর আধুনিকতা, অন্যকথায় মেদহীন কবিতাচর্চার নতুন ম্যাজিক। বোদলেয়ার কৃত আধুনিকতা, বুদ্ধদেব বসুর ক্লেদজ কুসুম অনুবাদের মাধ্যম বাঙালি কবিদের একসময় ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। অক্ষরবৃত্তের শক্তি আমরা দেখেছি কাদরীর কবিতায়। অন্তমিল ও অন্তরমিলের যাদুও। সার্বিকভাবে দেখা যায় শহীদ কাদরীর প্রধান অবলম্বন গদ্যচ্ছন্দ।

পাখিরা সিগন্যাল দেয়' কবিতায় এই অবচেতনতা আরো প্রকট। কবিতাটি অক্ষরবৃত্তে গদ্য-ছন্দে যেমন অব্যবস্থিত, তেমনি হঠাৎ কবিতার উপান্ত চারটি পঙক্তি অন্তমিলসম্পন্ন (পর/ঘর: মানা /ডানা) । অমিয় চক্রবর্তী তাঁর গদ্য কবিতায় যেমন অন্তমিল ব্যবহার করেছিলেন। এ সে রকম কোনো সচেতন প্রয়োগ নয়। বস্তুত উভয় বাংলাতেই পঞ্চাশ ও ষাটের কবিদের বুদ্ধদেব বসু তাঁর বোদলেয়ার অনুবাদের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেন । বাক্য ব্যবহারের সে ছায়াপাত কিছুটা লক্ষ্যণীয়–

শুধু যথার্থ হা –ঘরে যারা, বেকার, উপোসী
তারাই তাকে নির্বিকার, নোংরা আঙুলে বারবার খুঁজে পায়–
(শ.ক, ২/২৯-একবার দূর বাল্যকালে, পৃ:১০৮)

গদ্য ছন্দের যে কবিতাগুলো লক্ষ্য করা যায় সেগুলো হলো: 'তাই এ দীর্ঘ পরবাস, সব নদী ঘরে ফেরে, কোনো নির্বাসনই কাম্য নয় আর, স্বগতোক্তি, প্রবাসের পঙক্তিমালা,গন্তব্য, নিরুদ্দেশ যাত্রা' প্রভৃতি। যাতে সংলাপ, স্বগতোক্তি এবং প্রশ্নজর্জরিত, বাক্যের স্পন্দন তীক্ষ্ণ এবং ধারালো। গদ্য ছন্দের দৃষ্টান্তস্বরূপ–

১। শুনেছি জোছনা শুধু ধ্যানমৌন পাহাড়ের চূড়ায় কোনো
ত্রিশূল দেহ একাকী দরবেশ কিংবা হিমালয়ের পাদদেশে,
তোরাই জঙ্গলের অন্ধকারে, ডেরাকাটা বাঘের হলুদ শরীর নয়
তখনও জন্মায় জোছনা, ঝড়ে পড়ে গৃহস্থের সরল উদ্যানে [একবার দূর বাল্যকালে]
২। টাকাগুলো কবে পাবো?/ সামনের শীতে?...
হে কাল হে শিল্প, কবে/ আর কবে?
যখন পড়বে দাত, নড়বে দেহের ভিত [টাকাগুলো কবে পাবো]

আপাতভাবে অক্ষরবৃত্ত ধরনের সাজানো। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটির মধ্যে হয়তো একটু ছন্দাভাস আছে। তাঁর কবিতায় ছন্দগত দ্বিধা ছিলো। অক্ষরবৃত্ত আর গদ্য কবিতার দোলাচল তার কবিতায় বর্তমান। গদ্য কবিতাগুলো স্বচ্ছল কিন্তু

ভিতরে থেকে টান করে বাধা, আবেগের প্রপাত তাদের ভাসিয়ে নেয় নি। আবার তাঁর অক্ষরবৃত্ত গদ্য ছন্দের মতই বাক রীতিকেই দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করেছে। মুখের কথার ভিতর থেকে বের করে এনেছে কবিতার অর্থ ও আওয়াজ।

মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ যথার্থই লক্ষ করেছেন–

> শহীদ কাদরীর ছন্দবদ্ধ কবিতায় শব্দের সাথে শব্দের বিপদজনক মিলন তিনি ঘটাতে পারেন। উত্তরাধিকার কবিতায় টান টান উল্লম্ফগতি এবং সাবলীলভাবে ভাষা ও ভাবের চলার স্বাচ্ছন্দ-সূচারু বাগবৈদগ্ধ্য প্রখর উপস্থিত বুদ্ধি ও রসবোধ বিদ্যুৎ চমকের মতই তীব্র শ্লেষ অব্যর্থ লক্ষ্যভেদী ক্ষুরধার বাক্যবাণ সহজেই কাউকে ধরাশায়ী করার জন্য যথেষ্ট। (শহীদ কাদরী স্মারক গ্রন্থ/২২পৃ:)

শহীদ কাদরী স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত, গদ্যছন্দ ছাড়াও মুক্তক ছন্দের পটও উন্মোচন করেছেন। কবি মুক্তক অক্ষরবৃত্ত ব্যবহার করে হয়তো খানিকটা স্বাধীনতা তথা মুক্তির আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। যা তাঁর 'তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা' কবিতায় প্রকাশিত–

> ভয় নেই/আমি এমন ব্যবস্থা করব/যাতে সেনাবাহিনী
> গোলাপের গুচ্ছ কাঁধে নিয়ে/মার্চপাস্ট করে চলে যাবে
> এবং স্যালুট করবে/কেবল তোমাকে প্রিয়তমা।
> (শ.ক, ২/৩১-তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমা, পৃ:১১১)

সর্বোপরি শহীদ কাদরী তাঁর কবিতা রচনা করার ক্ষেত্রে ছন্দ বিন্যাসে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে না পারলেও গদ্য ছন্দ প্রয়োগের প্রতিই কবি ছিলেন প্রচন্ড আগ্রহী। তাই বলা যায় স্বাতন্ত্র্য বিষয় বৈশিষ্ট্য ও প্রকরণ বৈচিত্র্যে শহীদ কাদরী ছিলেন অনন্য এক কবি।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

শহীদ কাদরী পঞ্চাশের শেষে বয়সের তুলনায় পরিণতির ছাপ রেখে কাব্যজগতে সক্রিয় হয়ে উঠেন। ষাটের দশকে বাংলা সাহিত্য যখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যসর্বস্ব রূগ্ণ ও অবক্ষয়ী সংস্কৃতির ধারায় ঘুণেধরা ও বিকারগ্রস্ত প্রবণতায় অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে ; তখন শহীদ কাদরী এ বিনষ্টির পাপ ও পতনকে পবিত্র করে নেবার মানসে জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং বাস্তবতার নিরিখে কবিতায় স্বতন্ত্র ভাবনার উন্মেষ ঘটান। যার স্বীকারোক্তিমূলক প্রকাশ তাঁর কবিতায় বর্তমান। অনুসন্ধানী কবি যাযাবর প্রবণতা থেকে জীবনকে দেখেছেন। আজন্ম গৃহচ্যুত কবি খুঁজে ফিরেছেন টিয়ের মুক্তি আর উড়ন্ত পাখির শান্তি, সেইসাথে পরিতৃপ্ত মাছের অবাধ সাঁতার। সমকালীন বৈরী সভ্যতাকে কবি প্রকৃতির আশ্রয়ে মুক্তির প্রত্যাশা নির্দেশ করতে ব্যবহার করেছেন শালিক, খরগোশ, টিয়ে, হরিণ প্রভৃতি রূপকল্প। শহীদ কাদরীর কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছে - বিশ্ব নাগরিকতাবোধ, স্বদেশপ্রেম, আধুনিক নাগরিক জীবনের সুখ-দুঃখ, যুদ্ধকালীন মানব জীবনের ভয়াবহতা, আজন্ম গৃহচ্যুত হওয়া কবির অনিকেত ভাবনার প্রবাস জীবনের যন্ত্রণা । কবি তাঁর কবিতার বিষয়কে অত্যন্ত ঋজু ভাষায় বুদ্ধিদীপ্ত ও ঝকঝকে করে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে প্রকাশ করেন। কবিতা সম্পর্কে কীট্সের মন্তব্য প্রসঙ্গে শহীদ কাদরী উল্লেখ করেন –

> Poetry of the earth is never dead.' অর্থাৎ পৃথিবীতে কখনোই কবিতার দিন শেষ হবে না। কারণ রিপিটেশন হচ্ছে Emphasis করার একটা পদ্ধতি মাত্র। রিপিটেশন রিদম তৈরি করে। (ইকবাল হাসান সম্পাদিত:শহীদ কাদরী স্মারকগ্রন্থ-২০১৮,বাংলা একাডেমী,ঢাকা, পৃ: ১৫২)

শহীদ কাদরী ১০/১১ বছরে গোটা পাঁচেক কবিতা (নির্বাণ, এই শীতে, নর্তকী, শত্রুর সাথে একা, পরিক্রমা) রচনা করলেও তাঁর অধিকাংশ কবিতাই ষাটের দশকে রচিত। তাঁর কবিতায় যুদ্ধবিরোধী সাম্যবোধ তথা মানবতার সুর প্রকাশ পায়। অনুভবের দ্রষ্টা ও প্রশান্তময়তার অন্তরঙ্গ প্রজ্জ্বলিত কবি সত্তা শহীদ কাদরী ছেলেবেলায় বেড়ে ওঠার পরিবেশে দেখেন যুদ্ধ, মানুষের সাথে মানুষের অসমতা ও হিংস্রতা। কিন্তু সংবেদনশীল কবি জীবনের এ বিপর্যয়কে গভীরভাবে অনুভব করেন এবং তা বিষয় বৈচিত্র্য ও প্রকরণগত স্বতন্ত্ররূপে তুলে আনেন তাঁর কবিতায়। তিনি যেন ফরাসী দার্শনিক রুশো বর্ণিত 'ম্যান ইন দ্যা ন্যাচারাল স্টেট'। মানুষ ও প্রকৃতিকে একাত্ম করে কবি ব্যক্তিকে তারুণ্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাত্যহিক জীবনাভিজ্ঞতা চর্চায় শাণিত করেছেন। কবির চেতনায় স্বদেশপ্রীতি গ্রথিত থাকলেও তিনি ছিলেন পরিব্রাজক ও বৈশ্বিক। শহীদ কাদরী তাঁর কবিতায় –বন্দুকের বদলে গোলাপ, টাকার বদলে চন্দ্রমল্লিকা,পার্কের বেঞ্চিতে ব'সে গভীর রাতের নক্ষত্রপুঞ্জের লীলা, শুভ্র সিগারেটের জ্বলজ্বলে আগুনে মানুষের ক্ষতকে অনুভব করেছেন জীবনঘনিষ্ঠ অনুভবে। তারই অভিব্যক্তি–

> পোড়া ইটে যেমন থাকে কাঁচা ইটের সোহাগ, রেস্তোরাঁর খাদ্যে যেমন থাকে ফসলের সুবাস, যানবাহনের চাকায় যেমন সম্ভ্রমে এগোয় সময়, তেমনি তাঁর শৈশবের স্বপ্ন, যৌবনের দায় তাঁকে একান্তই কবিতায় নিমজ্জিত রেখেছেন। (শহীদ কাদরী স্মারক গ্রন্থ, প্রাগুক্ত, পৃ:৭১)

শহীদ কাদরী তাঁর কবিতায় জীবনাভিজ্ঞতার সত্যতাকে অন্তরে ধারণ করে বাস্তবতার নিরিখে প্রাত্যহিক জীবনের শব্দ ব্যবহার করেন। ইট , কাঠ, বালি, পাথরে গড়ে ওঠা নাগরিক মানুষের চেতনা জগতে কবি গ্রামীণ সারল্যের অনুভব প্রকাশ করেন- স্থান-কাল-পাত্রভেদের স্বতন্ত্র ভঙ্গিমায়। যা পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের সাহিত্যাঙ্গনে শহীদ কাদরীকে করে তুলেছে অনন্য। কবি গভীরভাবে জীবনের রং, সুধা, গন্ধকে অনুভব করেছেন এবং তাই প্রকাশ করেছেন প্রকরণগত বিশিষ্টতায়। যা কবিকে করে তুলেছে কালজয়ী।

কবি শহীদ কাদরী দেহগতভাবে বিলীন হলেও তাঁর পদচিহ্ন তথা কীর্তিময় চেতনার কর্ম তাঁকে দীপ্তিমান করেছে। বাংলা সাহিত্যজগতে তিনি তাঁর কর্মের মহিমায় বেঁচে থাকবেন আজীবন। কবির প্রিয় বিষয় মানুষ, ভালোবাসা , প্রকৃতি ও জীবনের গভীর উপলব্ধিবোধ। কবি তাঁর কবিতায় জীবনের অন্তর্গত বিষাদ আর একই সঙ্গে বৈরাগ্যকে ধারণ করে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের এক কাব্যভূমি তৈরি করেছেন , যা লালিত হবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। স্মৃতির যেমন প্রাত্যহিকতার গতানুগতিকতা থাকে , তেমনি থাকে - না ভুলা দিগন্ত দূরস্পর্শী চেতনা। সে চেতনায় শোক আর দুঃখের হাত ধরে আনন্দ আখ্যানও থাকে। তাই কেউ ভুলে, কেউ ভুলে না। কেউ আবার ভুলতেও দেয় না। কবিতা তো আসলে এক্ষেত্রে কবির জীবনদর্শন । শহীদ কাদরীর বোধ ছিল অসামান্য, সম্পূর্ণ ও স্পষ্ট। দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বচ্ছ ও তীক্ষ্ণ ; সেইসাথে আবেগের সঙ্গে প্রজ্ঞা, বোধের সঙ্গে বুদ্ধির সমীকরণ কবিকে দিয়েছে কিংবদন্তির অভিধা। আর তাই শহীদ কাদরী সময়ের পরিক্রমায় তাঁর কীর্তির মাধ্যমে বেঁচে থাকবেন আগামী প্রজন্মের কাছে যুগ থেকে যুগান্তরে । কারণ কর্মী নশ্বর হলেও কর্ম অবিনশ্বর।

গ্রন্থপঞ্জি

প্রাথমিক উৎস (Primary Source):

- শহীদ কাদরী, আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও, ২০০৯, অবসর প্রকাশনা সংস্থা।
- শহীদ কাদরী, উত্তরাধিকার, ১৯৬৭, সাহিত্য প্রকাশ।
- শহীদ কাদরী, কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই, ১৯৭৮, সাহিত্য প্রকাশ।
- শহীদ কাদরী, গোধূলির গান, আগস্ট ২০১৭, প্রথমা প্রকাশনা।
- শহীদ কাদরী, তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা, ১৯৭৪, সাহিত্য প্রকাশ।
- শহীদ কাদরী, শহীদ কাদরীর কবিতা, ১৯৯৩, সাহিত্য প্রকাশ।

দ্বৈতীয়িক উৎস (Secondary Source):

- অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কাব্য জিজ্ঞাসা, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।
- অনুপ সাদি, মার্কসবাদ(চিন্তা সিরিস), ২০১৬, ভাষা প্রকাশ,বাংলাবাজার , ঢাকা ।
- অমলেন্দু বসু , সাহিত্য লোক, ১৯৭১, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড।
- অশ্রু কুমার সিকদার , আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়, কলকাতা।
- অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত , ১৯৯০, দশম সংস্করণ, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।
- আজিজুল হক , অস্তিত্বচেতনা ও আমাদের কবিতা, ১৯৮৫, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।
- আদনান সৈয়দ, চেনা অচেনা শহীদ কাদরী, ২০১৮, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ।
- আফজালুল বাসার, বিশ শতকের সাহিত্যতত্ত্ব, ১৯৯১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
- আবদুল মান্নান সৈয়দ, করতলে মহাদেশ, শহীদ কাদরী, ১৯৯৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা।
- আবদুল মান্নান সৈয়দ , ঈশ্বর গুপ্ত থেকে শহীদ কাদরী-(ঊনবিংশ-বিংশ দুই শতাব্দীর নির্বাচিত ৩৫জন কবির পর্যালোচনা), নিজেস্ব প্রকাশনা।
- (ড.) আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯০৫-১৯৭১), ২০০৮, বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশনী।

- আবু সায়ীদ আইয়ুব, ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক: সাহিত্যেও চরম ও উপকরণমূল্য, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, দে'জ পাবলিশিং; কলকাতা ।
- ইকবাল হাসান সম্পাদিত, শহীদ কাদরী-কবি ও কবিতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৩, আগামী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০।
- ইকবাল হাসান, শহীদ কাদরী স্মারকগ্রন্থ, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৮, বাংলা একাডেমি প্রেস, ঢাকা।
- কবীর চৌধুরী, সাহিত্যকোষ, ১৯৮৪, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
- কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ১৯৯৫,জে.এন.ঘোষ অ্যান্ড সন্স, কলকাতা।
- খোন্দকার আশরাফ হোসেন, বাংলাদেশের কবিতা: অন্তরঙ্গ অবলোকন।
- গোপাল হালদার, বাঙ্লা সাহিত্যের রূপরেখা, ১৯৯২, মুক্তধারা ।
- জীবেন্দ্র সিংহ রায় , বাংলা অলংকার, ২০০২, কলকাতা, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড ।
- জীবেন্দ্র সিংহ রায়, বাঙলা ছন্দ, ১৯৯১, জিজ্ঞাসা পাবলিকেশনস্ (প্রা.) লি. কলিকাতা।
- জীবেন্দ্র সিংহ রায়, কাব্যতত্ত্ব, ডিসেম্বর ১৯৮৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩।
- দিলারা হাফিজ, বাংলাদেশের কবিতায় ব্যক্তি ও সমাজ, ২০০২, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
- দীপ্তি ত্রিপাঠী: আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, ১৯৯২, পঞ্চম সংস্করণ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা।
- নরেন বিশ্বাস, অলংকার অন্বেষা, ১৯৭৬, ঢাকা, কালিকলম।
- নীরু কুমার চাকমা , অস্তিত্ব বাদ ও ব্যক্তি স্বাধীনতা, ১৯৮৩, বাংলা একাডেমী।
- প্রসঙ্গ সাহিত্য-সংস্কৃতি, ১৯৮৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ।
- বদরুদ্দীন ওমর , পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১ম খন্ড-১৯৭০, ২য় খন্ড-১৯৭৬, ঢাকা মাওলা ব্রাদার্স।
- বায়তুল্লাহ্ কাদেরী , বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিতা বিষয় ও প্রকরণ, বৈশাখ ১৪২৬/এপ্রিল ২০০৯, নবযুগ প্রকাশনী, বাংলাবাজার,ঢাকা।
- বিপ্রদাশ বড়ুয়া , কবিতায় বাক প্রতিমা, ১৯৭৬, ঢাকা, মুক্তধারা।
- বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় , সাহিত্য বিবেক, ১৯৮৪, ২য় সংস্করণ, কলকাতা, দেজ পাবলিশিং।
- বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাংলাদেশের সাহিত্য, ২০০৯, আজকাল প্রকাশনী, বাংলবাজার, ঢাকা।

- বুদ্ধদেব বসু, কালের পুতুল, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-অর্কেস্ট্রা।
- মফিদুল হক, শহীদ কাদরীর কবিতা, ১৯৯২ প্রকাশকের নিবেদন ; সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।
- মাসুদুজ্জামান, বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতার তুলনামূলক ধারা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।
- মাসুদুল হকঃ বাংলাদেশের কবিতার নন্দনতত্ত্ব, প্রথম প্রকাশ মে ২০০৮, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
- মাহবুবা সিদ্দিকী, আধুনিক বাংলা কবিতায় সমাজ সচেতনতা, মে ১৯৯৪, বাংলা একাডেমি , ঢাকা।
- মুহাম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা, চর্যগীতিকা, ১৪১৪বঙ্গাব্দ, ষষ্ঠ সংস্করণ, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।
- (ড.) মুহাম্মদ এনামুল হক (স্বরবর্ণ অংশ), শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী (ব্যঞ্জনবর্ণ অংশ),সহযোগী সম্পাদক-স্বরোচিষ সরকার, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান , ২০১৫, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪, বাংলা একাডেমি।
- মুহিত হাসান, শহীদ কাদরীর সঙ্গে কথাবার্তা, ২০১৬, বাতিঘর, প্রেসক্লাব ভবন, চট্টগ্রাম।
- মোহাম্মদ মাহবুউল্লাহ, পঁচিশ বছরের কবিতাঃ 'উত্তরাধিকার', ১৯৭৪,শহীদ দিবস সংখ্যা।
- মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, বাংলা কবিতার ছন্দ, ১৫ আগস্ট১৯৭০, প্রতীতি প্রকাশনা , ঢাকা।
- মোহিতলাল মজুমদার, সাহিত্য-বিচারঃকবি ও কাব্য, ২০০৬,করুণা প্রকাশনী, কলকাতা।
- মোঃ রেজাউল ইসলাম, সাহিত্য তত্ত্ব কথা , ২০০৫, দুরন্ত পাবলিকেসন্স , বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০।
- রফিকউল্লাহ খান, বাংলাদেশের কবিতা সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর, ২০০২, একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা।
- শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত, অভিবাদন শহীদ কাদরী-(প্রথম প্রকাশ-সেপ্টেম্বর-২০১৬), বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১১০০।
- শাজাহান ঠাকুর, বাংলা ছন্দের রীতি, রূপ ও বিকাশ, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫, বাংলা একাডেমী ঢাকা।
- শুদ্ধস্বত্ব বসু, আধুনিক বাংলা কাব্যের গতি প্রকৃতি, ১৩৮০, মন্ডল বুক হাউস, কলকাতা।
- সরকার আমিন, বাংলাদেশের কবিতায় চিত্রকল্প,প্রথম প্রকাশ-২০০৬, বাংলা একাডেমি,ঢাকা ১০০০।
- সরদার ফজলুল করিম, দর্শনকোষ, ২০০২, প্যাপিরাস, ঢাকা।
- সাঈদ- উর রহমান, বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের সাহিত্য, ২০০৩, বাংলা একাডেমী।

- সাঈদ- উর রহমান , পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা, ১৯৮৩, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা।
- সুধীর কুমার নন্দী, নন্দনতত্ত্ব, তৃতীয় সংস্করণ-১৯৯৬, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ ।
- সৈয়দ আলী আহসান, আধুনিক বাংলা কবিতা: শব্দের অনুষঙ্গে : শহীদ কাদরী ; ২০০১, গতিধারা, ঢাকা।
- J.A.Cuddon -Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, Penguin Books, Third Editiion, 1992.
- Jean Paul, Sartre :Existentialism and Humanism-, 1948, Reprinted, 1970.
- Rout Ledge :Modernism Peter Childs, 2000., London.

পত্র-পত্রিকা

- আব্দুল মান্নান সৈয়দ: ৬০ এর লিটল ম্যাগাজিন ও আমাদের সাহিত্য'- উত্তরাধিকার, ১৯৭৭ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
- এম আব্দুল আলীম, আজন্ম বোহেমিয়ান শহীদ কাদরী, ৫ নভেম্বর, ২০১৯, বাংলাদেশ প্রতিদিন।
- কবিতা মাতাল এক বোহেমিয়ান কবি শহীদ কাদরী, *শালুক*, (সাহিত্য ও চিন্তা শিল্পের ছোট পত্রিকা); ডিসেম্বর ২০১৬, সংখ্যা -২১।
- কালি ও কলম : (সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা), ২০১৬, ত্রয়োদশ বর্ষ; নবম সংখ্যা।
- কালি ও কলম : (সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা), ষোড়শ বর্ষ;তৃতীয় সংখ্যা, ২০১৯।
- প্রথম আলো, ২৯ আগস্ট ২০১৬।
- সিদ্দিকা মাহমুদা, শহীদ কাদরীর উত্তরাধিকার, সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষ : ৩৭, সংখ্যা-২।
- সোহানা মাহবুব, শহীদ কাদরীর কবিতায় চিত্রকল্প, জুন ২০১৭, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ভাষা সাহিত্যপত্র, ত্রিচত্বারিংশৎ সংখ্যা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রবন্ধ

- আদনান সৈয়দ, একাকী পথিক ফিরে যাবে তার ঘরে, প্রাগুক্ত, ক্রোড়পত্র, কালি কলম।
- বায়তুল্লাহ্ কাদেরী ,শহীদ কাদরী সময়স্রোতে 'ঝকঝকে সদ্য ,নতুন নৌকো'প্রাগুক্ত ,ক্রোড়পত্র ,কালি কলম।
- বেগম আকতার কামাল, শহীদ কাদরীর কবিতায় জল ও ডাঙার দ্বৈরথ, ১৪২৩, কালিকলম, ত্রয়োদশ বর্ষ, নবম সংখ্যা।
- মাহবুব সাদিক, শহীদ কাদরীর কবিতা, প্রাগুক্ত, কালিকলম।
- শহীদ ইকবাল, শহীদ কাদরীর কবিতার সীবনগুচ্ছ, প্রাগুক্ত, কালি কলম।

সাক্ষাৎকার

- 'বাংলা কবিতা পড়ে আমি যে স্বাদ পাই, পশ্চিমা কোনো কবি তা আমাকে দেননি', সাদ কামালী, ২০১৬, শালুক।
- শুরু যেভাবে করলাম, সেভাবে তো শেষ করতে পারলাম না, ২০১৬ প্রথম আলো, ২ সেপ্টেম্বর ।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ

শ.ক - শহীদ কাদরী

তো.অ.প্রি - তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা

কো.কো.ক্র.নে - কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই

আ.চু. পৌ.দা. - আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও

গো.গা.- গোধূলির গান